বিশ্বনবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ

ইবনে কাইয়্যিম (রাহঃ) এর 'যাদুল মাআদ' হতে সংকলিত

প্রণেতা : ডক্টর আহ্মদ বিন উসমান আল-মায়্য়াদ,

কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ - সাউদী আরব।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আলীমুল্লাহ্

সম্পাদনায় : শায়খ মুহাম্মাদ রকীবুদ্দীন

ইসলামী গবেষণা ও ফাতওয়া অধিদপ্তর - রিয়াদ।

إصدار

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام

تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ت / ٤٨٢٦٤٦٦ فاكس ٤٨٢٧٤٨٩ ص ب ٣١٠٢١ الرياض ١١٤٩٧

رقم الحساب للكتب والأشرطة - مصرف الراجحي ١/٧٧٧٧ فرع أم الحمام ٢٨١

هَدي محمّد صلّى الله عليه وسلّم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه

منتقى من زاد المعاد للإمام ابن القيّم رحمه الله

لمؤلّفه / د. أحمد بن عثمان المزيد

كلية التربية – جامعة الملك سعود – الرياض

المترجم باللغة البنغالية / محمد عليم الله إحسان الله

مراجعة الترجمة / الشيخ محمد رقيب الدين أحمد حسين

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض

إصدار / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام

تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

ت / ٤٨٢٦٤٦٦ فاكس : ٤٨٢٧٤٧٩ ـ ص . ب : ٣١٠٢١ ـ الرياض : ١١٤٩٧

رقم حساب الكتب والأشرطة . مصرف الراجحي . ١/٧٧٧٧ فرع ام الحمام ٢٥١

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ ঃ
ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রাহঃ) এর 'যাদুল মাআদ' হতে সংকলিত।

প্রণেতা ঃ ডক্টর আহ্‌মদ বিন উসমান আল-মায্‌য়াদ,

কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ - সাউদী আরব।

অনুবাদক ঃ মুহাম্মাদ আলীমুল্লাহ্‌,

সম্পাদনায় ঃ শায়খ মুহাম্মাদ রকীবুদ্দীন,

ইসলামী গবেষণা ও ফাতওয়া অধিদপ্তর - রিয়াদ।

অনুবাদকের আরজ ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্ব-চরাচরের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের জন্যে, দরূদ ও সালাম মানবজাতির হেদায়েতের লক্ষ্যে প্রেরীত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল 'মুহাম্মাদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর আল ও আওলাদ এবং সাহাবীগণের প্রতি। অতঃপর আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহু বলেনঃ তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনই সর্বোত্তম আদর্শ।"-সূরা আহযাব, আঃ ২১, মহান আল্লাহ্ নবীজীকে সম্বোধন করে বলেনঃ "নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।"-সূরা কলম,আঃ ৪, আরো ইরশাদ হচ্ছে, হে নবী! তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। "-সূরা আলে ইমরান,আঃ ৩১, আর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মহৎ চরিত্রাবলীর পূর্ণতাদানের লক্ষ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি।"-মসনদে আহমদ, অথচ বর্তমানে ডেনমার্ক ও নারওয়েজ সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে মিথ্যা-অপবাদ রটানো হচ্ছে, মূলতঃ তারা সেই মহান নবীর জীবনাদর্শ সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নয়, যদি তারা তাঁকে চিনতো, তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হতো, তাহলে তারা অবশ্যই তাঁকে ভালবাসতো। সুতরাং তাঁর জীবনাদর্শমালাকে বাংলাভাষী ভাই-বোনদের খেদমতে পেশ করার লক্ষ্যে আমি ডক্টর আহমদ বিন উসমান আলে-মায্য়াদ" কর্তৃক সংকলিত 'হাদীয়ু মুহাম্মাদ ফী এবাদাতিহী ওয়া মুআমালাতিহী ওয়া আখলাক্বিহী' নামক বইটির অনুবাদ করার জন্য প্রয়াসী হই এবং অনুদিত সংস্করণ সহজ-সরল ভাষায় পাঠকের খেদমতে পেশ করার সর্বাত্মক যত্ন নেই, তদসত্ত্বেও অনুবাদে কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে আমাকে অবহিত করার জন্যে পাঠকবর্গের প্রতি বিনীত অনুরোধ করা হল। অবশেষে অসীম দয়ালু আল্লাহর নিকট আকুল আবেদনঃ তিনি যেন খালেসভাবে আমার পরিশ্রম কবূল করেন এবং এই কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া - অখেরাতের কল্যাণ প্রদান করেন, -আমীন।"

নিবেদক ঃ- আবূ মাহমূদ মুহাম্মাদ আলীমুল্লাহ্ বিন এহসানুল্লাহ্

উত্তর মন্দিয়, দারোগার হাট - ৩৯১২, ছাগল নাইয়া - ফেনী।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

অতঃপর নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত হলো ইসলাম, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত স্বভাবজাত এবং ন্যায়নীতি-ভারসাম্য, মধ্যমপন্থী ধর্ম, ইসলাম ইহকাল-পরকালের সকল কল্যাণ ও মঙ্গলকে আবেষ্টনকারী এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আখলাক-চরিত্রের ধর্ম, ইসলাম স্থান-কাল নির্বেশেষে সবার জন্য উপযোগী, ইসলাম সহজ-সাধ্য ও শান্তির ধর্ম, বরং ইসলামে রয়েছে সব সমস্যার সমাধান। অতএব বর্তমান যুগে বিশ্ব মানবতার সামনে ইসলামের সৌন্দর্য্য ও মৌলিক বৈশিষ্টাবলীর বর্ণনা কতই না জরুরী, যাতে বিশ্বের সামনে দ্বীন ইসলামের প্রকৃত ছবি ফুটিয়ে উঠে, মূলতঃ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ হলো এই মহান ধর্মের বাস্তব প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা স্বরূপ, তাঁর আদর্শমালায় রয়েছে উপরোক্ত বৈশিষ্টাবলীর সমাহার, যার ফলে দ্বীন ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা এবং বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছে সহজসাধ্য, কারণ ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আবেষ্টন করে তার সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে, তা আক্বীদাহ্-বিশ্বাস হোক কিংবা ইবাদত-উপসনা হোক, আদর্শ-চরিত্র হোক, পার্থিব কিংবা আধ্যাত্তিক হোক। আর এই বই যেটি আমি ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহঃ) কর্তৃক রচিত 'যাদুল মাআদ ফী হাদীয়ে খাইরিল এবাদ' হতে সংকলন করেছি যেটি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শমালা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে অনন্য-অতুলনীয়, মুলতঃ তাঁর জীবনাদর্শমালাকে বিশ্ব মানবতার সামনে ফুটিয়ে তোলার একটি প্রয়াস মাত্র, যাতে আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি এবং তাঁর আদর্শে আদর্শবান হতে পারি। আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদনঃ তিনি যেন ইখলাস বা তাঁর জন্য একনিষ্ঠতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করেন এবং এই কিতাবে বরকত দান করেন।"

লেখক ঃ- ডক্টর আহমদ বিন উসমান আলে-মায্য়াদ।

dr. almazyad @ gmail. com

(১) পবিত্রতা অর্জন ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/১৬৩}

(ক) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করা কালে তাঁর আদর্শমালা ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশ কালে বলতেনঃ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু-বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-ইস। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অপবিত্র নর জ্বিন ও অপবিত্র নারী জ্বিন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"-সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম, আর পায়খানা হতে বর্হিগমন কালে বলতেনঃ গোফ্‌রানাকা -অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"-সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী, (২) তিনি অধিকাংশ সময় বসাবস্থায় প্রস্রাব করতেন। (৩) তিনি কখনো পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন, আবার কখনো পাথর দিয়ে কুলুখ করতেন, আবার কখনো কুলুখ ও পানি উভয়টি ব্যবহার করতেন। (৪) তিনি ইস্তিঞ্জা ও কুলুখ বাম হাত দিয়ে সম্পাদন করতেন। (৫) তিনি পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা শেষে হাত মাটিতে ঘষে ধৌত করে নিতেন। (৬) তিনি সফর কালে প্রস্রাব-পায়খানা যাওয়ার সময় সাথীদের থেকে অনেক দূরে চলে যেতেন, যাতে কেউ দেখতে না পায়। (৭) এই উদ্দেশ্যে তিনি কোন বস্তুর আড়ালে গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন, কখনো খেঁজুর শাখার বৃক্ষরাজী দ্বারা, আবার কখনো উপত্যকার কোন বৃক্ষ দ্বারা। (৮) তিনি প্রস্রাবের সময় নরম জায়গা বা বালুকাময় ভূমি চয়ন করতেন। (৯) তিনি প্রস্রাব-পায়খানার জন্য বসার আগেই কাপড় উঠাতেন না। (১০) তিনি প্রস্রাব করার সময় কেউ সালাম করলে উত্তর দিতেন না।"

(খ) অযু করার সময় তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/১৮৪}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করতেন, আবার কখনো এক অযু দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। (২) তিনি কখনো এক মুদ {অর্থাৎ, এক সা'-এর এক-চতুর্থাংশ, কম-বেশী -৭৫০ মিঃলিঃ পরিমান।"-অনুবাদক} পানি দ্বারা অযু করতেন, আবার কখনো মুদের দুই তৃতীয়াংশ দ্বারা, আবার কখনো মুদের চেয়ে বেশী পানি দ্বারা। (৩) তিনি অযু করার সময় সর্বাধিক কম পানি ব্যবহার করতেন এবং স্বীয় উম্মতকে পানি অপব্যয় করা হতে সতর্ক করতেন। (৪) তিনি অযুর অঙ্গগুলো এক-একবার, দু'-দু'বার ও তিনি-তিনবার ধৌত করতেন, আবার কোন অঙ্গ দু'বার ও অন্য অঙ্গ তিনবার ধৌত করেন, তবে কখনই তিন বারের অধিক ধৌত করেননি। (৫) তিনি 'মাযমাযা'-তথা কুলি করা ও 'ইস্তিনশাক্ব'-তথা নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে পরিস্কার করা কখনো এক চিল্লু পানি দ্বারা সম্পাদন করতেন, আবার কখনো দুই চিল্লু পানি দ্বারা, আবার কখনো তিন চিল্লু পানি দ্বারা করতেন, বস্তুতঃ তিনি 'মাযমাযা' ও 'ইস্তিনশাক্ব' লাগাতার করতেন। (৬) তিনি ডান হাতে নাকে পানি দিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক ঝেড়ে পরিস্কার করতেন। (৭) তিনি যখনই অযু করতেন তখনই 'মাযমাযা' ও 'ইস্তিনশাক্ব' করতেন। (৮) তিনি সমগ্র মাথা (একবার) মাসেহ করতেন, আবার কখনো স্বীয় হস্তদ্বয় মাথার অগ্রভাগে রেখে পিছন পর্যন্ত নিয়ে যেতেন এবং পুনরায় পিছন থেকে উভয় হাত অগ্রভাগে টেনে আনতেন। (৯) তিনি মাথার শুধু অগ্রভাগ মাসেহ করলে, তখন বাকী অংশ পাগড়ীর উপর মাসেহ করে সম্পূর্ণ করতেন। (১০) তিনি মাথার সাথে স্বীয় কানদ্বয়ের ভিতর ও বাহিরের অংশ মাসেহ্ করতেন। (১১) তিনি স্বীয় পাদ্বয় (গোড়ালি পর্যন্ত) ধৌত করতেন, যখন তাতে চামড়া কিংব সূতার মোজা না হতো। (১২) তিনি অযুর

কার্যাবলী লাগাতার ও ধারাবাহিকতার সাথে সম্পন্ন করতেন, এতে কখনই বিঘ্ন সৃষ্টি করেননি। (১৩) তিনি بِسْمِ اللّٰهِ -'বিসমিল্লাহ্' বলে অযু শুরু করতেন এবং অযু শেষে বলতেনঃ

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

উচ্চারণঃ আশ-হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু ; আল্লা-হুম্মাজ আলনী মিনাত-তাওয়াবীনা, ওয়াজ-আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।"-সুনানে তিরমিযী, অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও একক, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাহ্কারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন।"-সুনানে তিরমিযী, তিনি আরো বলতেনঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশ্হাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লা-আনতা, আস্তাগফিরুকা, ওয়াআতূবু-ইলাইক।"-অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি পাক-পবিত্র তোমারই প্রশংসা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট তাওবাহ করি। (১৪) তিনি অযুর শুরুতে 'নাওয়্যাইতু রাফআল হাদাস' কিংবা 'নাওয়্যাইতু ইসতেবাহাতুস সালাত' ইত্যাদি গদবাঁধা শব্দ পাঠ করে নিয়্যাত করেননি, তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ কখনই এমনটি করেননি {বরং নিয়্যাত হলো অন্তরে পবিত্রতা অর্জনের সংকল্প করা।"-অনুবাদক} (১৫) তিনি কখনই কনুইদ্বয় ও গোড়ালিদ্বয়ের উপরে ধৌত করেননি। (১৬) অযু শেষে অঙ্গগুলি মুছে শুকানো তাঁর অভ্যাস ছিল না। (১৭) তিনি কখনো দাড়ির ভিতরে

পানি দিয়ে দাড়ি খেলাল করতেন, কিন্তু তা নিয়মিত সব সময় করেননি। (১৮) তিনি হাত ধুয়ার সময় এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ভরে দিয়ে খেলাল করতেন, কিন্তু তা নিয়মিত সব সময় করেননি। (১৯) অযু করার সময় সর্বদা অন্যে পানি ঢেলে দেয়া তাঁর নীতিমালা ছিল না, কিন্তু কখনো তিনি নিজেই পানি ঢেলে অযু করতেন, আবার কখনো প্রয়োজন বিশেষে তাঁর সাহাবীদের কেউ পানি ঢেলে দিতেন।"

(গ) মোজার উপর মাসেহ্ করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ১/১৯২}

(১) সহীহ্ সনদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি সফরকালে এবং গৃহে অবস্থানকালে মোজার উপর মাসেহ্ করেছেন এবং মুক্বিম (মুসাফির নয়) ব্যক্তির জন্যে একদিন-একরাত, আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন-তিনরাত মাসেহ্ করার সময় সীমা নির্ধারণ করেন। (২) তিনি খুফ্ তথা চামড়ার তৈরী মোজার উপরের ভাগে মাসেহ্ করতেন এবং জাওরাব তথা সূতা বা পশমী মোজার উপরও মাসেহ্ করেন, তিনি শুধু পাগড়ীর উপরও মাসেহ্ করেন, আবার কখনো মাথার অগ্রভাগ মাসেহ্ করে বাকী অংশ পাগড়ীর উপর সম্পূর্ণ করেন। (৩) তিনি বিনা প্রয়োজনে (মোজা পরিধান কিংবা খোলার মাধ্যমে) অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেন না, বরং পাদ্বয়ে মোজা থাকলে মাসেহ্ করতেন, নচেৎ পাদ্বয় ধৌত করতেন।"

(ঘ) তায়াম্মুমে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/১৯২}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মাটি দ্বারা যার উপর নামায আদায় করা যায় তায়াম্মুম করতেন, তা মাটি হোক কিংবা গন্ধকযুক্ত ভূমি হোক অথবা বালুকাময় ভূমি হোক, আর বলতেনঃ

যেখানেই আমার উম্মতের কারো নামাযের সময় উপস্থিত হবে, সেখানেই তার নামায আদায় করার স্থান ও পবিত্রতা অর্জন করার বস্তু বিদ্যমান রয়েছে।"-মসনাদে ইমাম আহমাদ, (২) তিনি দূর-দূরান্ত সফরের সময় সাথে মাটি বহন করে নিতেন না এবং এর আদেশও করেননি। (৩) তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য তায়াম্মুম করেননি এবং এর নির্দেশও দেননি, বরং তায়াম্মুমের বিধানকে ব্যাপক করতঃ অযুর বিধানের স্থলাভিসিক্ত করেছেন। (৪) তিনি মুখমণ্ডল, কব্জিদ্বয়ের জন্য যমীনে একবার হাত মেরে তায়াম্মুম করতেন।"

(২) সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ ঃ

{যাদুল মাআদঃ ১/১৯৪}

(ক) সানা পাঠ ও কেরাআত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

(১) যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন, তখন তিনি 'তাকবীর'-আল্লাহু আকবর' বলে সালাত শুরু করতেন এর পূর্বে কিছুই পাঠ করতেন না এবং তিনি কখনই নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করেননি। (২) তিনি তাকবীরে তাহ্রীমা বলার সময় স্বীয় দু'হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা করে তালু ক্বিবলামুখী অবস্থায় দু'কানের লতি বরাবর কিংবা কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর রাখতেন। (৩) তিনি কখনো নিম্নোক্ত দু'আটি দ্বারা ইসতেফ্তাহ্ পাঠ করতেনঃ

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا
كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِن خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা বা-য়িদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা-বা-আদ'তা বাইনাল্ মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্লা-হুম্মা নাক্কিনী মিনায যুনূবি ওয়াল খাত্বা-ইয়া, কামা ইউনাক্কাস্ সাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্ দানাস্।

আল্লা-হুম্মাগ্সিলনী মিন খাত্বা-ইয়া-ইয়া, বিল মা-য়ি ওয়াস্-সালজি ওয়াল্-বরদি।"-সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম, অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমার ও আমার গুনাহ্-খাতার মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি কর যেমনটি দূরত্ব সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ্! আমার পাপ ও ভুলত্রুটি সমূহ হতে আমাকে এমনভাবে পরিস্কার ও পবিত্র কর যেমনভাবে সাদা বস্ত্র ময়লা হতে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ্! আমার যাবতীয় পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও ; আবার কখনো তিনি নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেনঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ

উচ্চারণঃ অজ্জাহ্তু অজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামা-ওয়াতি অলআরযা হানীফাউ অয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন, ইন্না স্বালাতী, ওয়া নুসুকী, ওয়া মাহয়্যা-য়্যা, ওয়া মামাতী, লিল্লাহি রাব্বিল আ'-লামীন, লা-শারিকালাহু ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু, ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমীন ;-অর্থাৎ, আমি সেই মহান সত্তার দিকে একনিষ্টভাবে আমার মুখ ফিরাচ্ছি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমাত্র বিশ্বজগতের প্রভূ-প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, তাঁর কোন শরীক-অংশীদার নেই, আর এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত।"-সহীহ্ মুসলিম, (৪) তিনি ইসতিফ্তার দু'আ পাঠ করার পর 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বোনির রাজীম'-বলে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। (৫) তিনি নামাযে দু'বার সেক্তা বা বাকরুদ্ধ বা নিশ্চুপ থাকতেন, একবার তাকবীরে তাহ্রীমা ও কেরাতের মধ্যখানে, বস্তুতঃ দ্বিতীয়টি সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে, কোন কোন বর্ণনায় তা ছিল সূরা

ফাতিহা পাঠ করার পর, অন্য বর্ণনায় রয়েছে তা ছিল রুকুর পূর্বে। (৬) তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর আরো একটি সূরা পাঠ করতেন। কখনো কেরাত লম্বা করতেন, আবার কখনো সফর বা অন্যকোন বিশেষ কারণে কেরাত হাল্কা করতেন, তবে তিনি অধিকাংশ সময়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। (৭) তিনি ফজরের নামাযে প্রায় ষাট আয়াত, এমনকি একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন। তিনি ফজরের নামায সূরা 'ক্ব-ফ' দ্বারা পড়েন, এবং সূরা 'আর-রূম' দ্বারা, আবার সূরা 'আত-তাকভীর' দ্বারাও পড়েন। তিনি ফজরের উভয় রাকয়াতে সূরা যিল্‌যাল্‌ পাঠ করেন। তিনি সফরকালে ফজরের নামায 'মোয়াউযাতাইন'-সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস দ্বারা পড়েন। একদা তিনি ফজরের নামাযে সূরা আল-মু'মিনূন পাঠ আরম্ভ করেন, অতঃপর প্রথম রাকায়াতে মূসা ও হারূন (আঃ) এর ঘটনা পর্যন্ত পৌছলে তাঁর কাশি আসে, তখন তিনি রুকু করে ফেলেন। (৮) তিনি জুম'আর দিন ফজরের নামায 'আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ্‌ ও আদ-দাহ্‌র' সূরাদ্বয় দ্বারা পড়তেন। (৯) তিনি যুহরের নামাযে কখনো কেরাত লম্বা করতেন, পক্ষান্তরে আসরের নামায যুহরের কেরাতের অর্ধেক হতো যদি তা লম্বা হয়ে থাকে, আবার সেই অনুপাতে সংক্ষিপ্ত হতো। (১০) তিনি মাগরিবের নামায একবার সূরা 'আত-ত্বোর' দ্বারা আদায় করেন, আরেকবার সূরা 'আল-মুরসালাত' দ্বারা। (১১) এশার নামাযে তিনি সূরা 'আত-তীন' পাঠ করেন এবং তিনি মুআয (রাযিঃ) জন্য এশার নামাযে সূরা 'আশ-শামস' ও সূরা 'আল-আ'ল'া এবং সূরা 'আল-লাইল' অথবা অনুরূপ সূরাসমূহ পাঠ করা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, আর মুআয (রাযিঃ) কর্তৃক এশারের নামাযে সূরা বাক্বারা পাঠ প্রসঙ্গে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। (১২) তাঁর আদর্শ ছিল এক রাকাতে পূর্ণ সূরা পাঠ করা, আবার অনেক সময়ে তিনি

এক সূরা দু'রাকাআতে পূর্ণ করতেন, আবার অনেক সময় তিনি সূরার প্রথমাংশ পাঠ করতেন, কিন্তু (ফরয নামাযে) সূরার শেষাংশ কিংবা মধ্যমাংশ থেকে পাঠ করতেন বলে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুই সূরা এক রাকাআতে পাঠ করা তা নফল নামাযে করতেন। একই সূরা দুই রাকাআতে পাঠ করা তা তিনি খুবই কম করতেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট করতেন না, যে ঐ সূরা সেই নামাযেই পড়তে হবে, একমাত্র জুম'আ ও দুই ঈদের নামায ব্যতীত। (১৩) তিনি ফজরের নামাযে এক মাস পর্যন্ত রুকুর পরে দু'আ কুনুত পড়েছিলেন, অতঃপর তা পরিত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁর এ কুনুত পাঠ কারণবশতঃ ছিল, {অর্থাৎ,'রাআল'-'যাকওয়ান' গোত্রদ্বয়ের লোকেরা বি'রে মাউনার নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করে সত্তর জন সাহাবীকে হত্যা করলে তাদের উপর বদ-দোআ স্বরূপ এক মাস পর্যন্ত তিনি কুনুতে নাযিলাহ্ পাঠ করেন।"-অনুবাদক} অতঃপর উক্ত কারণ শেষ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট হুকুমও নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে তাঁর আদর্শ ছিল বিশেষ বিপদাপদের সময় কুনুতে নাযিলাহ্ পাঠ করা, তবে তা ফজরের নামাযের সাথে নির্দিষ্ট ছিল না।

(খ) সালাতের পদ্ধতি প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ১/২০৮}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সালাতের প্রথম রাকাতকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা দীর্ঘায়িত করতেন। (২) তিনি কেরাত পাঠ শেষে শ্বাস ফিরে আসা পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকতেন। অতঃপর উভয় হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকু করতেন এবং দু'টো হাত দিয়ে হাঁটু দু'টো ধারণকারীর ন্যায় আঁকড়ে ধরতেন এবং উভয় হাত পাঁজরা থেকে তীরের রশির মতো সোজা করে রাখতেন এবং পিঠটা টেনে সোজা রাখতেন, বস্তুতঃ মাথাটা উঁচু করতেন না এবং খুব নিচুও করতেন

না, বরং কোমর ও পিঠের বরাবর রাখতেন। (৩) তিনি রুকুতে কখনো বলতেনঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ উচ্চারণঃ সুব্হা-না রাব্বিয়াল আযীম।"-সহীহ্ মুসলিম, অর্থাৎ, আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" আবার কখনো বলতেনঃ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي উচ্চারণঃ সুব্হানাকা আল্লা-হুম্মা, রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, -অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আবার কখনো বলতেনঃ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ উচ্চারণঃ সুব্বু-হুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার্রূহ।"-সহীহ্ মুসলিম, অর্থাৎ, সকল ফিরিশ্তা ও জিবরাইলের প্রতিপালক অত্যন্ত পুত ও পবিত্র। (৪) সাধারণতঃ তাঁর রুকু-সিজদাহ্গুলো দশবার তাসবীহ্ পাঠ করার সমপরিমাণ লম্বা হতো, তবে কখনো রুকু-সিজদাহ্ ক্বিয়ামের সমপরিমাণ দীর্ঘায়িত করতেন, কিন্তু তা শুধুমাত্র 'সালাতুল লাইল' বা রাত্রিকালীন নামায তাহাজ্জুদে করতেন, নচেৎ অধিকাংশ সময় তাঁর নীতিমালা ছিল যে, সমন্বয় ও সুষ্ঠরূপে সালাত আদায় করা। (৫) তিনি سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ উচ্চারণঃ 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদা' বলে স্বীয় মাথা উঠাতেন।"-সহীহ্ বোখারী, তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং স্বীয় পিঠ সোজা করতেন, অনুরূপ যখন তিনি স্বীয় মাথা সিজদাহ্ হতে উত্তোলন করে পিঠ সোজা করতেন, আর সতর্ক করে বলতেনঃ যেই ব্যক্তি রুকু-সিজদায় তার পিঠ সোজা করে না, তার সালাতই হয় না।"-সুনানে তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিনি রুকু থেকে সোজা হয়ে উঠার পর বলতেনঃ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ - وربما قال- رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - وربما قال اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - উচ্চারণঃ রাব্বানা ওয়া-লাকাল হামদ। অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! তোমারই জন্যে সকল প্রশংসা। আবার অনেক সময়ে

বলতেনঃ রাব্বানা লাকাল হামদ। আবার অনেক সময়ে বলতেনঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ। (৬) তিনি এই ক্বিয়ামের রুকনকে রুকুর সমপরিমাণ দীর্ঘায়িত করতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেনঃ

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বানা, ওয়া-লাকাল হাম্‌দু, মিলআস সামা-ওয়াতি ওয়া মিলআল আরযি, ওয়া মিলআ মা-শি'তা মিন্ শাইয়িন বা'অদু ; আহ্‌লাস সানা-য়ি ওয়াল মাজদ, আহাক্কু মা-ক্বালাল আব্দু ওয়া কুল্লুনা লাকা আব্দু ; আল্লা-হুম্মা লা-মানিআ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'অতা ওয়ালা য়্যানফাউ যাল-জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।"-সহীহ্ মুসলিম, -অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশমণ্ডলী ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পরিপূর্ণ করে দেয়, আর এগুলি ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়, হে প্রশংসা ও গৌরবের অধিকারী! বান্দার সবচেয়ে সত্যকথা, বস্তুতঃ আমরা সকলই তোমার বান্দা, হে আল্লাহ্! তুমি যা প্রদান কর তা রোধ করার, যা তুমি রোধ কর তা প্রদান করার সাধ্য কারো নেই, আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। (৭) অতঃপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যেতেন এবং তখন হাতদ্বয় উঠাতেন না। তখন প্রথমে হাঁটুদ্বয় তারপর উভয় হাত, অতঃপর কপাল ও নাক মাটিতে রাখতেন, তিনি কপাল ও নাকের উপর সিজদা করতেন, পাগড়ীর প্যাচের উপর নয়। তিনি বেশী বেশী যমীনের উপর এবং পানিযুক্ত কাদামাটির উপর সিজদা করতেন এবং খেজুরের পাতা দ্বারা বানানো চাটাই ও পাকা চামড়ার বিছানার উপর সিজদা করতেন। (৮)

তিনি সিজদা অবস্থায় স্বীয় কপাল ও নাক পুরোভাবে যমীনে রাখতেন এবং উভয় হাত যমীন থেকে উপরে উঠিয়ে শরীরের দু'পার্শ্ব হতে পৃথক করে ব্যবধানে রাখতেন, ফলে বগলের সাদা অংশ পর্যন্ত দেখা যেতো। (৯) তিনি সিজদায় স্বীয় হাত কাঁধ বরাবর কিংবা দু'কানের লতি বরাবর রাখতেন এবং সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন পাদ্বয়ের আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী করে রাখতেন, দু'হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলো মাটিতে বিছিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতেন খোলে কিংবা গুছিয়ে রাখতেন না। (১০) তিনি কখনো বলতেনঃ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي উচ্চারণঃ সুব্হানাকা আল্লা-হুম্মা, রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী। বোখারী, আবার কখনো বলতেনঃ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ উচ্চারণঃ সুব্বূ-হুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার্রূহ।"-সহীহ্ মুসলিম, (১১) সিজদার দু'আ পাঠ শেষে তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত উত্তোলন না করে মাথা উঠাতেন। অতঃপর সোজা হয়ে বাম-পা বিছিয়ে উহার উপর বসতেন এবং ডান-পা খাড়া রাখতেন, উভয় হাত উভয় উরুর উপর রেখে উভয় কনুই উভয় উরু বরাবর উপরে রাখতেন, আর ডান হাত হাঁটু সংলগ্ন অংশের উপর রেখে কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দু'টো মুঠো করে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধ আঙ্গুল দু'টোর মাথা এক জায়গায় করতঃ শাহাদাত আঙ্গুলটি উপরে তুলে ইশারা ও নড়াচড়া করে বলতেনঃ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي উচ্চারণঃ আল্লা-হুমাগফিরলী, ওয়ার-হামনী, ওয়াজ-বুরনী, ওয়াহ্-দিনী, ওয়াআ-ফিনী, ওয়ার-যুক্বনী।"-সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে হেদায়াত দাও, আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং আমাকে রিজেক্ব দাও। (১২) তাঁর আদর্শ ছিল এই রুকন তথা দু'সেজদার

মাঝখানের বসাটাকে সেজদার সমপরিমাণ দীর্ঘায়িত করা। (১৩) অতঃপর তিনি উভয় উরুর উপর ভর দিয়ে পাদ্বয়ের প্রথমাংশের উপর (দ্বিতীয় রাকাতের জন্যে) সোজা দাঁড়াতেন, আর দাঁড়ানোর সাথে সাথে কেরাত পাঠ আরম্ভ করতেন এবং প্রথম রাকাতের ন্যায় দু'আ ইসতিফ্তা পাঠ করার জন্য নিশ্চুপ থাকতেন না। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের ন্যায় আদায় করতেন শুধু চারটি বিষয় ব্যতীত, (১) তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর নিশ্চুপ থাকা, (২) দু'আ ইসতিফতা পাঠ করা (৩) তাকবীরে তাহ্‌রীমা, (৪) প্রথম রাকাতকে দীর্ঘায়িত করা, তিনি প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা লম্বা করতেন, আবার অনেক সময়ে তিনি প্রথম রাকাত ততক্ষণ দীর্ঘায়িত করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আগন্তক ব্যক্তির পায়ের আওয়াজ আর শুনতেন না। (১৪) তিনি যখন তাশাহ্‌হুদের জন্য বসতেন, তখন ডান-হাত ডান-উরুর উপর এবং বাম-হাত বাম-উরুর উপর রেখে তর্জনী বা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন, বস্তুতঃ তখন শাহাদাত আঙ্গুলটি সোজা খাড়া কিংবা একেবারে বিছিয়ে রাখতেন না, বরং সামান্য ঝুঁকিয়ে রাখতেন, আর কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুল দু'টো মুঠো করে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধ আঙ্গুল দু'টোর মাথা এক জায়গায় করতঃ শাহাদাত আঙ্গুলটি উত্তোলন করে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করতেন এবং তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন। (১৫) তিনি এ বৈঠকে সর্বদা আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন এবং সাহাবীদেরকে তা শিক্ষা দিতেন ঃ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্-স্বালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যেবা-তু, আস্-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু ওয়া-রাহমাতুল্লা-হি ওয়া-বারাকা-তুহ, আস্-সালামু আলাইনা ওয়া-আলা ইবাদিল্লাহিস্ স্বালিহীন,

আশ্হাদু আল-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।"-সহীহ্ বোখারী -অর্থাৎ, যাবতীয় মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত খালেসভাবে আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত, হে নবী! আপনার উপর সকল প্রকার শান্তি, আল্লাহ্‌র রহ্মত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক, আমাদের উপর ও আল্লাহ্‌র সকল নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।" তিনি এই বৈঠক খুবই সংক্ষেপ করতেন, যেন তিনি কোন উত্তপ্ত পাথরের উপর বসে সালাত আদায় করছেন। অতঃপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে উভয় উরুর উপর ভর দিয়ে উভয় পায়ের প্রথমাংশের উপর (তৃতীয় রাকাতের জন্যে) সোজা দাঁড়াতেন এবং স্বীয় হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন, আবার অনেক সময়ে শেষ দু'রাকাতে সূরা ফাতিহার পর কোরআনের কিছু অংশ পড়তেন। (১৬) তিনি শেষ তাশাহ্হুদে তাওয়াররূক করে বসতেন, -অর্থাৎ, তিনি পাছাকে যমীনে ভর করে বসে স্বীয় পা এক দিকে বের করে দিতেন।"-সুনানে আবূ দাউদ, আর বাম-পাকে ডান উরু ও পিণ্ডলীর নিচ দিয়ে ডান দিকে বের করে দিয়ে ডান-পা খাড়া করে রাখতেন, আবার কখনো ডান-পা বিছিয়ে রাখতেন, তখন ডান-হাত ডান-উরুর উপর করতঃ তর্জনী বা শাহাদাত আঙ্গুলটি খাড়া করে রাখতেন, তিনি সালাতের শেষাংশে এ দু'আ দ্বারা প্রার্থনা করতেন

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ আযাবিল্-ক্বাবরি, ওয়া-আ'উযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিল মাসীহিদ-দাজ্জালি, ওয়া-আ'উযুবিকা মিন্

ফিত্‌নাতিল্ মাহ্ইয়া-য়া ওয়া ফিত্‌নাতিল্-মামা-ত, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ মা'সামি ওয়াল-মাগরাম।"-সহীহ্ বোখারী -অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আরো দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আরো আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার জীবনের বিপর্যয় এবং মৃত্যুর যাতনা হতে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সমস্ত গুণাহ ও সব রকমের ঋণের দায় হতে। অতঃপর 'আস্-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' বলে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাতেন। (১৭) তিনি মুসল্লীকে সুতরা নিতে বলতেন, যদিও তীর ধনুক কিংবা লাঠি দ্বারা হয়, সফরকালে ও মাঠে-ময়দানে তাঁর জন্যে সুতরাস্বরূপ বর্শা গেড়ে রাখা হতো, তিনি তার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। তিনি স্বীয় সাওয়ারীকে চওড়াভাবে রেখে সে দিকে সালাত আদায় করতেন। তিনি পাল্কি হাত দ্বারা সোজা করে তার শেষ প্রান্তের কাঠের দিকে ফিরে নামায পড়তেন। (১৮) তিনি দেয়ালের দিকে ফিরে সালাত আদায় করলে তাঁর ও দেয়ালের মাঝখানে একটি বকরী যাতায়াতের পথ বাকী থাকতো। তিনি সুতরা থেকে দূরত্বে দাঁড়াতেন না, বরং সুতরার নিকটবর্তী হতে নির্দেশ দিতেন।"

(গ) নামাযের অবস্থায় তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/২৪১}

(১) নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানো তাঁর আদর্শ ছিল না। (২) নামাযের মধ্যে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করা তাঁর নীতি ছিল না। (৩) তিনি নামায পড়ার সময় স্বীয় মাথা একটু নিচু করে রাখতেন। তিনি সালাত লম্বা করার ইচ্ছায় আরম্ভ করতেন, কিন্তু শিশুর কান্না শুনে তার মায়ের উপর কঠিন হওয়ার ভয়ে তা সংক্ষেপ করে ফেলতেন। (৪) তিনি কখনো তাঁর নাতনী উমামা বিনত যায়নাবকে কাঁধে বহন করে ফরয নামায আদায়

করতেন, যখন রুকু-সেজদায় যেতেন তখন তাকে কাঁধ থেকে রেখে দিতেন, আবার যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে কাঁধে বহন করে নিতেন। (৫) তিনি নামাযরত অবস্থায় কখনো হাসান কিংবা হুসাইন (রাযিঃ) এসে তাঁর পিঠে সাওয়ার হতো, তখন পিঠ থেকে পড়ে যাওয়াকে অপছন্দ করায় তিনি সেজদা দীর্ঘায়িত করতেন। (৬) তিনি নামায আদায় করতেন, তখন আয়েশা (রাযিঃ) বাহির থেকে এলে হেঁটে গিয়ে তাঁর জন্য দরজা খুলে দিতেন, অতঃপর স্বীয় মুসল্লায় ফিরে আসতেন। (৭) তিনি নামাযরত অবস্থায় হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দিতেন। (৮) তিনি নামাযরত অবস্থায় ফুঁক দিতেন এবং (আল্লাহর ভয়ে) স্বশব্দে ক্রন্দন করতেন এবং প্রয়োজনে গলা পরিস্কার করতেন। (৯) তিনি কখনো খালি পায়ে নামায পড়তেন, আবার কখনো জুতা পরিহিত অবস্থায়। ইয়াহুদীদের বিরোধিতার লক্ষ্যে কখনো জুতা পরিধান করে নামায অদায় করার নির্দেশ দিতেন। (১০) তিনি কখনো এক কাপড়ে নামায আদায় করেতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি দু'টি কাপড়ে নামায পড়তেন।"

(গ) সালাত শেষে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/২৮৫}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের পর তিনবার বলতেনঃ আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্, -অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" অতঃপর বলতেনঃ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্‌তাস্ সালামু ওয়া-মিন্‌কাস্ সালাম, তাবা-রাক্‌তা ইয়া-যাল্‌জালা-লি ওয়াল-ইক্‌রাম।"-সহীহ্ মুসলিম, -অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি উৎসারিত হয়, তুমি বরকতময় হে মহত্ম ও সম্মানের অধিকারী।" তিনি উক্ত দু'আ দু'টি

কিবলামুখী পড়ে তাড়াতাড়ী ডান কিংবা বাম দিক দিয়ে ঘুরিয়ে মুক্তাদীগণের মুখামুখি হয়ে বসতেন। (২) তিনি ফজরের নামায আদায় করতঃ নামাযের স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন।"-সুনানে তিরমিযী, (৩) তিনি প্রত্যেক ফরয নামায শেষে নিম্নোক্ত দু'আগুলো পাঠ করতেন

لا إلهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اللّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدّ - لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللّهِ - لا إلهَ إلا اللّهُ وَلا نَعْبُدُ إلا إيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ - لا إلهَ إلا اللّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ --

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা-মানিআ লিমা আ'অতাইতা ওয়ালা মুঅ'তিয়া লিমা মানা'অতা, ওয়ালা ইয়ান্ফায়ু যাল্জাদ্দি মিনকাল্ জাদ্দু।"-সহীহ্ বোখারী, লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লা-হ্। লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুন্নে'অমাতু ওয়ালাহুল ফাযলু ওয়ালাহুস সানাউল হাসান। লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু, মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন।"-সহীহ্ মুসলিম, -অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও একক তাঁর কোন শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ্! তুমি যা দিয়েছ তা রোধ করার কেউ নেই, আর যা তুমি রোধ করেছ তা দান করার সাধ্য কারো নেই, আর ধনবানের ধন তোমার আযাবের মুকাবিলায় কোন উপকার করতে পারে না।"--অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎকাজ করার কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, সকল নে'আমত ও সকল অনুগ্রহ তাঁরই, আর তাঁরই সকল সুন্দর গুণগান। আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, আমরা তাঁর ইবাদতের জন্যই নিবেদিত,

যদিও তা কাফেরদের নিকট অপছন্দনীয়। (৪) তিনি স্বীয় উম্মতকে প্রত্যেক ফরয নামায শেষে 'সুবহানাল্লাহ্' ৩৩ বার, 'আল-হামদুলিল্লাহ্' ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' ৩৩ বার পাঠ করতঃ

لا إلهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, ১ বার পড়ে মোট ১০০ বার পূর্ণ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।"

(ঘ) নফল ও রাত্রিকালীন নামায প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ১/৩১১}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত নামায ও সাধারণ নফল নামায সমূহ সাধারণতঃ স্বগৃহে আদায় করতেন, বিশেষ করে মাগরিবের সুন্নাত। (২) তিনি মুক্বিম অবস্থায় সর্বদা দশ রাকাত নামায নিয়মিত পড়তেন, যোহরের পূর্বে দুই রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর ঘরে এসে দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত। (৩) তিনি সকল নাফল নামায হতে ফজরের সুন্নাতের প্রতি সর্বাধিক তৎপর ছিলেন। তিনি ফজরের সুন্নাত এবং বিতরের নামায কখনই ছাড়েননি, সফর অবস্থায়ও না আর মুক্বিম অবস্থায়ও না, আর তাঁর থেকে সফরকালীন অবস্থায় এই দু'টি নামায ছাড়া অন্য কোন নফল নামায পড়া প্রমাণিত নেই। (৪) তিনি ফজরের সুন্নাত পড়ে ডান কাতে শুইতেন। (৫) তিনি কখনো যোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। একদা যোহরের পরের দু'রাকাত ছুটে গেলে আসরের পর তা আদায় করেন। (৬) তিনি অধিকাংশ সময়ে তাহাজ্জুদের নামায দাঁড়ানো অবস্থায় আদায় করতেন, আবার অনেক সময় বসে বসে আদায় করেন, আবার কখনো বসে বসে কেরাত পড়তেন, সামান্ন্য কেরাত

অবশিষ্ট থাকতে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় রুকু করতেন। (৭) তিনি তাহাজ্জুদের নামায আট রাকাত পড়তেন এবং প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন। অতঃপর তিনি একটানা পাঁচ রাকাতে বিতিরের নামায পড়তেন এবং সর্বশেষে শুধু একবার বসতেন, অথবা নয় রাকাতে বিতির পড়তেন এভাবে যে, আট রাকাত একটানা পড়ার পর বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম না ফিরায়ে আবার উঠে এক রাকাত পড়ে বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাতেন, পরন্তু বিতরের সালামের পর আরো দু'রাকাত পড়তেন, কিংবা উক্ত নয় রাকাতের ন্যায় সাত রাকাতে বিতর পড়তেন, অতঃপর আরো দু'রাকাত বসে পড়তেন। (৮) তিনি রাতের প্রথমাংশে, মধ্যমাংশে ও শেষাংশে বিতরের নামায আদায় করেন। তিনি ইরশাদ করেন যে, তোমরা তোমাদের রাত্রিকালীন নামাযের শেষাংশ বিতর করো।"-সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম। (৯) তিনি বিতরের পর দু'রাকাত কখনো বসা অবস্থায় পড়তেন, আবার কখনো উক্ত দু'রাকাতে বসা অবস্থায় কেরাত পাঠ করার পর রুকু করার ইচ্ছা করলে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় রুকু করতেন। (১০) তিনি ঘুমিয়ে পড়া কিংবা অসুখের কারণে তাঁর রাত্রিকালীন সালাত -তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে তিনি দিনে {দুপুর হওয়ার পূর্বে ১১ রাকাতের পরিবর্তে} ১২ রাকাত নামায আদায় করতেন। (১১) তিনি কোন এক রাতে তাহাজ্জুদে একটি আয়াত {সূরা মায়েদার ১১৮ নং আয়াতটি} তিলাওয়াত করেন এবং সেটি সকাল পর্যন্ত বারংবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন।"-সুনানে ইবনে মাজাহ, (১২) তিনি রাত্রিকালীন নামাযে কখনো নিম্নঃস্বরে, আবার কখনো উচ্চঃস্বরে কোরআন পাঠ করতেন, আর ক্বিয়াম কখনো লম্বা, আবার কখনো সংক্ষিপ্ত করতেন। (১৩) তিনি বিতিরের নামাযে 'সূরাতুল আ'লা ও সূরা 'কাফিরূন' এবং সূরা 'ইখলাস' পাঠ করতেন, যখন

সালাম ফিরাতেন তখন তিন বার বলতেনঃ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس উচ্চারণঃ সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস,- তৃতীয়বারে তিনি এই শব্দগুলো একটু বেশী টেনে উচ্চঃস্বরে বলতেন।"-সুনানে আবূ দাউদ, নাসাঈ।"

(৩) জুম'আহ্ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/৩৫৩}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ ছিল জুম'আর দিনকে বড় মনে করা ও মর্যাদাবান জ্ঞান করা এবং কতিপয় বৈশিষ্টাবলী সেই দিনের জন্যে নির্ধারণ করা। তন্মধ্যে জুম'আর দিনে গোসল করা, সবচেয়ে উত্তম কাপড় পরিধান করা, ইমামের খুৎবা মনযোগ সহকারে ওয়াজিব মনে করে শ্রবণ করা, বেশী বেশী করে নবীজীর উপর দরূদ পাঠ করা। (২) লোক সমবেত হয়ে গেলে তিনি মসজিদে প্রবেশ করে উপস্থিত সবাইকে সালাম দিতেন, তারপর মিম্বরে উঠে লোকদের মুখী হয়ে সালাম করতেন, তারপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বসতেন, তখন বিলাল (রাযিঃ) আযান শুরু করতেন, আযান শেষে হওয়ার সাথে সাথেই তিনি খুৎবা আরম্ভ করতেন এবং আযান ও খুতবার মধ্যে কোন কালপেক্ষণ করতেন না। তাঁর জন্যে মিম্বর তৈরী করার পূর্বে তিনি ধনুক কিংবা লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা দিতেন। (৩) তিনি সর্বদা মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন, অতঃপর সামান্য বসে পুনরায় উঠে দ্বিতীয় খুৎবা দিতেন। (৪) তিনি লোকদেরকে তাঁর নিকটবর্তী হয়ে নীরবে মনযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেনঃ যে ব্যক্তি খুৎবার সময় তার সাথীকে বললোঃ তুমি চুপ থাক! সেই ব্যক্তিও অর্থহীন কাজ করলো, আর যে কেউ তখন অর্থহীন কাজ করল তার জুম'আ বিনষ্ট হয়ে গেল। (৫) খুৎবা দেওয়ার সময় তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেতো, স্বর উচ্চ হতো এবং তাঁর

রাগভাব খুব বেড়ে যেতো, মনে হতো যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে হামলার ভয় প্রদর্শনকারী। (৬) তিনি খুৎবায় 'আম্মা বাআদু' বলতেন এবং খুৎবা সংক্ষিপ্ত, আর নামায লম্বা করতেন। (৭) তিনি খুৎবায় সাহাবীদেরকে ইসলামী নীতিমালা, শরীয়াতের বিধি-বিধানসমূহ শিক্ষা দিতেন এবং উপস্থিত প্রয়োজন অনুযায়ী আদেশ-নিষেধ করতেন। (৮) তিনি উপস্থিত প্রয়োজনে কিংবা কারো প্রশ্নের উত্তর দানের উদ্দেশ্যে খুৎবা বন্ধ করে দিতেন, প্রয়োজন সেরে পুনরায় খুৎবা সমাপ্ত করতেন, প্রয়োজনে কখনো তিনি মিম্বর থেকে নেমে প্রয়োজন সেরে পুনরায় মিম্বরে ফিরে যেতেন। তিনি উপস্থিত চাহিদা অনুযায়ী বক্তব্য রাখতেন, তিনি সেখানে কোন ক্ষুধার্ত কিংবা অভাবগ্রস্থ লোক দেখলে তাদেরকে দান-সদকা করার নির্দেশ দিতেন এবং সে জন্যে উৎসাহিত করতেন। (৯) তিনি খুৎবায় আল্লাহর নাম উচ্চারণকালে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। অনাবৃষ্টির কারণে অভাব দেখাদিলে তিনি খুৎবায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন। (১০) তিনি জুম'আর নামায শেষে ঘরে গিয়ে দু'রাকাত সুন্নাত পড়তেন, আর যারা মসজিদে আদায় করতেন তাদেরকে চার রাকাত পড়ার নির্দেশ দিতেন।"

(৪) দুই ঈদের নামাযে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/৪২৫}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামায সর্বদা ঈদগাহে আদায় করতেন এবং সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরিধান করে সুসজ্জিত হতেন। (২) তিনি ঈদুল ফিতরের দিন সকালে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় খেঁজুর খেতেন, পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিন সকালে ঈদগাহ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত কিছু খেতেন না, বরং ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে কোরবানীর গোস্ত খেতেন। তিনি ঈদুল

ফিতরের সালাত একটু বিলম্বে, আর ঈদুল আযহার সালাত সকাল-সকালে আদায় করতেন। (৩) তিনি ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যেতেন এবং তাঁর আগে একটি বর্শা উঠায়ে নিয়ে যাওয়া হতো, ঈদগাহে পৌছার পর তা সুতরাস্বরূপ স্থাপন করা হতো, যাতে তিনি তার দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন। (৪) তিনি ঈদগাহে পৌছে আযান-ইক্বামত ছাড়াই ঈদের নামায শুরু করতেন, এমনকি 'নামায শুরু হলো' এ কথাটিও বলতেন না, ঈদগাহে পৌছে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ ঈদের নামাযের পূর্বে কিংবা পরে কোন নামায পড়তেন না। (৫) তিনি খুৎবার পূর্বে ঈদের দু'রাকাত নামায পড়তেন, প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে তাকবীরে তাহরীমাহ্ সহ লাগাতার সাতটি তাকবীর দিতেন, প্রতি দুই তাকবীরের মাঝে সামান্য একটু চুপ থাকতেন, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট দু'আ পড়তেন বলে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাকবীর শেষে কেরাত আরম্ভ করতেন এবং কেরাত শেষে তাকবীর বলে রুকু করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে লাগাতার আরো পাঁচটি তাকবীর দিতেন, তারপর কেরাত পাঠ করে যথাযথ নিয়মে নামায সম্পন্ন করতঃ মানুষের সম্মুখিন হয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন, এ অবস্থায় মানুষেরা নিজ-নিজ কাতারে বসে থাকতো তিনি তাদেরকে ওয়াজ-নস্বীহত ও আদেশ-নিষেধ করতেন। তিনি প্রথম রাকাতে সূরা ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ক্বামার পড়তেন, আবার কখনো প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশীয়াহ পাঠ করতেন। (৬) তিনি যমীনে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন এবং সেখানে কোন মিম্বর ছিল না। (৭) তিনি খুৎবা শোনার জন্যে না বসারও অনুমতি দেন। আর পবিত্র ঈদ যদি জুম'আর দিনে হয়, তাহলে ঈদের নামায জুমআর জন্য যথেষ্ট হবে বলেন। (অর্থাৎ, সেদিন জুমআর নামাযের পরিবর্তে যোহরের নামায আদায় করলে

যথেষ্ট হবে। (৮) তিনি ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করে এক রাস্তায় ঈদগাহে যেতেন এবং অপর রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরে আসতেন।”

(৫) সূর্য গ্রহণ কালে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/৪৩৩}

(১) যখন একবার সূর্য গ্রহণ হল তখন তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাড়াহুড়া করে স্বীয় চাদর টানতে টানতে মসজিদের দিকে বের হন এবং অগ্রসর হয়ে লোকদের নিয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর লম্বা একটি সূরা উচ্চঃস্বরে পাঠ করলেন, তারপর খুব লম্বা করে রুকু করলেন, অতঃপর রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে দীর্ঘক্ষণ ক্বিয়াম করলেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করলেন তখন বললেনঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ 'সামিআল্লা-হু লিমান হামিদা' রাব্বানা ওয়া-লাকাল হামদ। অতঃপর আবার ক্বেরাত শুরু করেন এবং এরপর পুনরায় রুকু করলেন, তবে এই রুকু তুলনামূলকভাবে প্রথম রুকুর চাইতে হাল্কা ছিল, তারপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন, অতঃপর লম্বা সিজদা করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতে তাই করলেন যা প্রথম রাকাতে করেছিলেন। তাই প্রত্যেক রাকাতে দুই রুকু ও দুই সিজদা ছিল। অতঃপর নামায শেষে তিনি গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চতর ভাষাসম্পন্য খুৎবা প্রদান করলেন। (২) তিনি সূর্য গ্রহণের সময় আল্লাহর যিকর-সালাত ও আল্লাহর নিকট দু'আ-ইসতিগ্ফার, দান-খায়রাত এবং গোলাম আযাদ করার নির্দেশ প্রদান করেন।”

(৬) ইস্তেস্কা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/৪৩৯}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবার সময় মিম্বরের উপর ইস্তিসকা, অর্থাৎ, বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন, জুমআর দিন ছাড়াও তিনি ইস্তিসকা করেন, একদা তিনি মসজিদে নববীতে বসা অস্থায়

দু'হাত উত্তোলন করেন এবং মহান আল্লাহ্র নিকট ইস্তিসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনা করেন। (২) ইস্তিসকার সময় নিম্নোক্ত কতিপয় দু'আ পাঠ করা তাঁর থেকে প্রমাণিত রয়েছে ঃ

اللَّـهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাসহি ইবা-দাকা, ওয়া বাহীমাতাকা, ওয়ানশুর রাহ্মাতাকা, ওয়া আহয়ী বালাদাকাল মাইয়্যাত।'-অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি তোমার বান্দাদেরকে এবং জীব-জন্তুদেরকে পানি পান করাও, আর তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও এবং তোমার মৃত শহরকে সজীব কর। তিনি আরো বলতেনঃ

اللَّـهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাসকিনা গাইছাম-মুগীছান, মুরীআন, না-ফিআন-গায়রা যা-ররিন, আজিলান-গায়রা আ-জিলিন।"-সূনানে আবূদাউদ, অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি পান করাও যা ফরিয়াদ দূরকারী, পিপাসা নিবারণকারী, সাচ্ছন্দ প্রদানকারী, শষ্য-ফসল উৎপাদনকারী, উপকারী, অপকারী নয়, শীঘ্রই, বিলম্বে নয়। (৩) তিনি যখন মেঘ ও বাতাসের প্রচণ্ডতা দেখতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ভয়-বিষন্নতা দেখা যেতো, তবে বৃষ্টি বর্ষণ শেষ হয়ে গেলে তা দূর হয়ে যেতো। (৪) তিনি বৃষ্টির সময় এ দু'আটি বলতেনঃ اللَّـهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا- উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সাইয়্যাবান না-ফিআন।"-সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম, অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! মুসলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও। আর তিনি শরীরের কাপড় খুলে দিতেন, যাতে বৃষ্টির ফোটা গায়ে পড়ে, এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলেনঃ বৃষ্টি তার প্রভুর নিকট হতে নবাগত।"-সহীহ্ মুসলিম, (৫) সাহাবীগণ তাঁর নিকট অতি বৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি বৃষ্টি বন্ধের জন্যে দু'আ করে বলেনঃ

اللَّـهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّـهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না ওয়ালা আলায়না, আল্লা-হুম্মা আলাল্-আ-কামে, ওয়াল-জিবালে, ওয়ায-যিরাবে, ওয়া বুতূনিল-আওদীয়াতে, ওয়া মানা-বিতিশ শাজারে।"-সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম, -অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমাদের আশে-পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর আমাদের উপর নয়, হে আল্লাহ্! টিলা-পাহাড়, নদী-নালা, খাল-বিল, বন-জঙ্গল এবং বৃক্ষ উৎপাদনের জায়গায় বৃষ্টি বর্ষণ কর।"-সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম,

(৭) সালাতুল খাওফ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ১/৫১০}

(১) সালাতুল খাওফ বা যুদ্ধ ও ভয়-ভীতির সময়কার নামায প্রসঙ্গে তাঁর নীতিমালা ছিল যে, শত্রু সেনাদল যদি তাঁর মাঝে ও ক্বিবলার মাঝে অবস্থান করে থাকে, তবে তিনি মুসলিম সৈন্যদেরকে তাঁর পিছনে দু'কাতারে সারিবদ্ধ করে নামাযের জন্য তাকবীর বলতেন এবং তাঁরাও তাকবীর বলে নামায শুরু করতো, অতঃপর তাঁরা সবাই রুকু করতেন এবং এক সাথে রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, অতঃপর প্রথম কাতারের সেনাদল সিজদায় যেতো এবং দ্বিতীয় কাতারের সেনাদল শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি দণ্ডায়মান হতো, আর যখন তিনি দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন পিছন কাতারের সেনাদল দু'টি সিজদা করে দাঁড়িয়ে প্রথম কাতারের স্থানে অগ্রসর হতো এবং প্রথম কাতারের সেনাদল দ্বিতীয় কাতারে চলে যেতো, এভাবে সবাই প্রথম কাতারের ফযিলত অর্জন করতো এবং দ্বিতীয় কাতারের সেনাদল তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাকাতের সিজদায় যেতেন, অতঃপর রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর উভয় দল তাই করতো যা প্রথম রাকাতে করেছিলো, অতঃপর যখন তিনি তাশাহ্হুদের জন্য বসতেন, তখন পিছনের কাতারের সেনাদল দু'টি সিজদা করে তাঁর সাথে তাশাহ্হুদে মিলিত হতো, আর সবাই এক সাথে

সালাম ফিরাতো। (২) শত্রু সেনাদল ক্বিব্‌লা ছাড়া অন্য কোন দিকে অবস্থান করলে, তখন তিনি কখনো মুসলিম সেনাদলকে দু'ভাগ করে একভাগকে শত্রু সৈন্যদলের মুখোমুখি করতেন এবং অপর ভাগকে নিয়ে তিনি নামাযে দাঁড়াতেন, তখন এই দল তাঁর সাথে এক রাকাত নামায আদায় করার পর শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি অবস্থানরত দলের নিকট চলে যেতো এবং শত্রু সৈন্যদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতো, অতঃপর দ্বিতীয় দলটি এসে তাঁর সাথে নামাযে শরীক হয়ে এক রাকাত আদায় করতো, অতঃপর তিনি সালাম ফিরালে প্রত্যেক দলই ইমামের সালামের পর নিজে নিজে এক রাকাত পড়ে নামায পূর্ণ করতো। (৩) আবার কখনো তিনি একদলকে নিয়ে এক রাকাত পড়ার পর যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন এ দলটি তাদের দ্বিতীয় রাকাত পূর্ণ করে তাঁর রুকুর পূর্বেই সালাম ফিরাতো, অতঃপর দ্বিতীয় দল এসে তাঁর সাথে অপর রাকাত পড়তো, অতঃপর তিনি যখন তাশাহ্‌হুদের জন্য বসতেন, তখন এ দলটি দাঁড়িয়ে তাদের অপর রাকাত পূর্ণ করতো, আর তিনি তাশাহ্‌হুদে তাদের অপেক্ষা করতেন, পরন্ত এই দলটি তাশাহ্‌হুদ পাঠ করার পর তাদেরকে সাথে নিয়ে সালাম ফিরাতেন। (৪) আবার কখনো তিনি এক দলকে নিয়ে দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর দ্বিতীয় দলকে নিয়ে আবার দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতেন। (৫) আবার কখনো এক দলকে নিয়ে এক রাকাত পড়তেন এবং এ দল চলে যেতো এবং নামায পূর্ণ করতো না, অতঃপর দ্বিতীয় দলটি এসে তাঁর সাথে এক রাকাত পড়তো এবং নামায পূর্ণ করতো না, এভাবে তিনি দু'রাকাত পড়তেন, কিন্তু তারা এক এক রাকাত আদায় করতো।"

(৮) মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ১/৪৭৯}

(১) মৃতব্যক্তির কাফন-দাফন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ছিল সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ এবং অন্যান্য জাতির নীতিমালা হতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র এবং মৃতব্যক্তি, তার পরিবার-পরিজন ও আত্মিয়-স্বজনের প্রতি দয়া-অনুগ্রহের সর্বোত্তম নিদর্পণ, যার প্রথমে ছিল অসুস্থতার সময় তাকে দেখা-শোনা করা, পরকালীন জীবনের সুখ-শান্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাকে ওসীয়াত ও তাওবা করার জন্য উৎসাহিত করা, আর উপস্থিত লোকদের নির্দেশ প্রদান করা, তারা যেন তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্যবাণীর তাল্‌ক্বীন করে থাকে, যাতে তার সর্বশেষ কথা উক্তবাণী হয়। (২) তিনি ছিলেন আল্লাহর ফায়সালার উপর সৃষ্টির সর্বাধিক সন্তুষ্ট এবং সর্বাধিক তাঁর প্রশংসাকারী, তিনি ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুতে দয়াপরশ হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে ক্রন্দন করেন, কিন্তু তাঁর অন্তর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শোকরে পরিপূর্ণ এবং যবান মুবারাক আল্লাহর যিকর ও প্রশংসায় মাশগুল ছিল। তিনি ইরশাদ করেনঃ চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয় এবং অন্তর দুঃখিত হয়, কিন্তু মুখে শুধু এমন কথাই বলে থাকি, যাতে প্রভু সন্তুষ্ট হন।"-সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম, (৩) জাহিলী যুগের অনুসরণে গাল চিরে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ও চিৎকার করে মৃতের জন্য বিলাপ করতে তিনি নিষেধ করেন। (৪) তাঁর আদর্শ ছিল মাইয়্যেতের কাফন-দাফনে তাড়াহুড়া করা, মাইয়্যেতকে পরিস্কার-পবিত্র করা এবং সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া। (৫) তাঁর আদর্শ ছিল মাইয়্যেতের মুখমণ্ডল ও শরীর ঢেকে দেয়া এবং তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেয়া। (৬) তিনি কখনো মাইয়্যেতকে চুমু দিতেন। (৭) তিনি মাইয়্যেতকে তিনবার, পাঁচবার, প্রয়োজনবোধে আরো বেশী বার ধৌত করার এবং শেষ বারে তার

গায়ে কর্পূর কিংবা কর্পূর জাতীয় কোন সুগন্ধ বস্তু ছিটিয়ে দিতে আদেশ করেন। (৮) তিনি যুদ্ধে নিহত শহীদকে গোসল দিতেন না এবং তাঁদের থেকে চামড়ার নির্মিত বস্তু ও লোহাজাতিয় জিনিসসমূহ খোলে নিতেন, আর তাঁদের রক্তমাখা কাপড়-চোপড়সহ দাফন করতেন এবং তাঁদের উপর জানাযার নামায কখনও পড়েননি। (৯) হজ্জ-ওমরার ইহ্‌রামকারী ব্যক্তিকে কুল পাতা মিশানো পনি দ্বারা গোসল দিতে এবং তার ইহ্‌রামের কাপড় দ্বারা কাফন দিতে নির্দেশ দেন, আর তাকে কোন সুগন্ধি বস্তু স্পর্শ করানো এবং তার মাথা ইজার দ্বারা ঢেকে দিতে নিষেধ করেন। (১০) তিনি মৃতের অভিভাবককে সুন্দর ও সাদা কাপড়ে কাফন দেয়ার নির্দেশ দেন এবং কাফনে বেশী দামী কাপড় ব্যবহার করতে বারণ করেন। (১১) তাঁর আদর্শ ছিল যদি কাফন ছোট-খাট হতো, যদ্বারা মাইয়্যেতের সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করা হতো না, তাহলে তিনি তার মাথা ঢেকে পায়ের দিকে কিছু তাজা ঘাস রেখে দিতেন।"

(ক) জানাযার নামায প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ১/৪৮৫}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের বাহিরে মাইয়্যেতের উপর জানাযার নামায আদায় করতেন, আবার কখনো মসজিদের ভিতর জানাযার নামায পড়েন, কিন্তু তা তাঁর নিয়মিত আদর্শ ছিল না। (২) যখন তাঁর নিকট কোন মাইয়্যেত আনা হতো, তখন তিনি তার ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।"-সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম, তার উপর কোন ঋণ না থাকলে জানাযার নামায পড়তেন, নচেৎ তিনি নিজে তার উপর জানাযার নামায পড়তেন না, সাহাবীদেরকে পড়ার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর আল্লাহ্ যখন তাঁকে বিজয়ী করেন, তখন তিনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়েন এবং নিজেই

তার ঋণ পরিশোধ করতেন, আর তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে দিতেন। (৩) তিনি যখন জানাযার নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর দিতেন তারপর আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকির্তন করতেন এবং দু'আ করতেন, আর তিনি চার তাকবীর দ্বারা জানাযার নামায আদায় করতেন, তবে কখনো পাঁচ তাকবীর দেন। (৪) তিনি মাইয়্যেতের জন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করার নির্দেশ দেন এবং তাঁর থেকে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ সংরক্ষিত আছে ঃ-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تُفْتِنَّا بَعْدَهُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী-হাইয়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা, ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা, ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা, ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্‌সা-না, আল্লা-হুম্মা মান্‌ আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আলাল ইসলাম, ওয়ামান তাওয়াফ-ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা-তাহ্‌রিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না-বা'আদাহ।"-সুনানে তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, আর আমাদের ছোট-বড় এবং আমাদের নর-নারী সবাইকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ্‌! আমাদের মধ্য হতে যাকে তুমি জীবিত রাখতে চাও, তাকে তুমি ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর যাকে তুমি মৃত্যু দিতে চাও, তাকে তুমি ঈমানের উপর মৃত্যু দাও, হে আল্লাহ্‌! এই মাইয়্যেতের প্রতিদান থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমাদের ফেতনায় লিপ্ত করো না।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফির লাহু, ওয়ার হামহু, ওয়া আ-ফিহী, ওয়াঅফু আনুহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়া ওয়াস্‌সিঅ মুদখালাহু, ওয়াগসিল্‌হু বিলমা-য়ি ওয়াস্ সালজি ওয়াল বারাদি, ওয়া নাক্‌কিহী মিনাল খাতায়া কামা-নাক্কাইতাস্ সাওবাল্ আব্‌ইয়াযা মিনাদ-দানাস, ওয়া আব্‌দিলহু দারান্ খাইরাম মিন্ দা-রিহী ওয়া আহ্‌লান্ খাইরাম মিন্ আহ্‌লিহী ওয়া যাওজান্ খাইরান্ মিন্ যাওজিহী, ওয়া আদ্‌খিল্‌হুল জান্নাতা, ওয়া আয়িয্‌হু মিন্ আযাবিল ক্বাব্‌রি ওয়া মিন্ আযাবিন্ না-র।"-সহীহ্ মুসলিম, অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ তুমি তাকে মাফ কর, তার উপর রহম কর, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখ, তাকে ক্ষমা কর, মর্যাদার সাথে তার অতিথিয়েতা কর, তার বাসস্থান প্রশস্থ করে দাও, তুমি তাকে ধৌত কর পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুণাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিস্কার করা হয়, আর তার পার্থিব ঘরের চেয়ে তুমি তাকে একটি উত্তম ঘর দান কর এবং তার পরিবারের বদলে এক উত্তম পরিবার এবং জুড়ার চেয়ে এক উত্তম জুড়া দান কর, আর তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল কর এবং কবরের আযাব ও জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে তাকে মুক্তি দাও। (৫) তিনি পুরুষ লাশের মাথা বরাবর এবং মহিলা লাশের মাঝ বরাবর দাঁড়াতেন। (৬) তিনি নাবালেগ শিশুর উপর জানাযার নামায পড়তেন, আর তিনি আত্মহত্যাকারী এবং গনীমতের মালে খেয়ানতকারীর উপর জানাযার নামায পড়তেন না। (৭) তিনি জুহেনিয়্যাহ গোত্রের সেই মহিলা উপর জানাযার নামায পড়েন, যার উপর তিনি ব্যভিচারের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করেছিলেন। (৮) তিনি বাদশাহ নাজাশীর উপর গায়েবী জানাযা পড়েন, কিন্তু প্রত্যেক মাইয়্যেতের উপর গায়েবী জানাযা পড়া তাঁর আদর্শ ছিল না। (৯) তাঁর আদর্শ ছিল কারো উপর জানাযার নামায ছুটে গেলে, তিনি তা তার

কবরের উপর আদায় করতেন।"

(খ) দাফন ও উহার সংশ্লিষ্ঠ বিষয়াদি প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ১/৪৯৮}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযা শেষে লাশের আগে-আগে পাঁয়ে হেঁটে গোরস্থান পর্যন্ত যেতেন এবং যানবাহনে আরোহণকারীদের জন্য লাশের পিছনে থাকা সুন্নাত করেন, আর পাঁয়ে হেঁটে গমনকারীগণ যেন লাশের নিকটে থাকে সামনে কিংবা পিছনে, ডানে কিংবা বামে, এবং লাশ বহন করে তাড়াতাড়ি চলার নির্দেশ দেন। (২) তিনি বসতেন না যতক্ষণ না যমীনে লাশ রাখা হতো। (৩) তিনি জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন, কিন্তু বসে থাকাও তাঁর থেকে সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে। (৪) তাঁর আদর্শ ছিল সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত এবং ঠিক দুপরের সময় মাইয়্যেত দাফন না করা। (৫) তাঁর আদর্শ ছিল কবর লাহ্দ করা, কবর গভীর করা এবং মাইয়্যেতের মাথা ও পাঁদ্বয় বরাবর কবরকে প্রসস্থ করা। (৬) তিনি দাফন শেষে মাইয়্যেতের উপর তার মাথার দিক থেকে তিনবার মাটি নিক্ষেপ করতেন। (৭) তিনি মাইয়্যেত দাফন শেষে তার কবরের উপর দাঁড়িয়ে সওয়াল-জওয়াবে সাবিত থাকার জন্য দু'আ করেন এবং সাহাবীগণকে এ বিষয়ে নির্দেশ দেন।"-সূনানে আবূ দাউদ, (৮) তিনি কবরের উপর বসে (কোরআনুল কারীম হতে) কিছু পাঠ করতেন না, আর না মাইয়্যেতকে সওয়াল-জওয়াব শিক্ষা দিতেন। (৯) তাঁর আদর্শ ছিল মাইয়্যেতের জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি না করা, বরং তিনি তা থেকে কঠোরভাবে বারণ করতেন।"

(গ) কবর ও শোকবার্তা বা সান্তনা প্রদান প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/৫০৪}

(১) তাঁর আদর্শ ছিল না কবরসমূহ উঁচু করা, তার উপর ঘর তৈরী করা, পাথর-ইট ইত্যাদি দিয়ে গম্বুজের মত তৈরী করা। (২) তিনি আলী (রাযিঃ) -কে ইয়ামেন দেশে প্রেরণ করেন, যাতে সকল মুর্তি ভেঙ্গে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে ফেলেন এবং সকল উঁচু কবরকে ভেঙ্গে সমান করে দেন। অতএব তাঁর আদর্শ হলো সকল উঁচু কবরকে ভেঙ্গে সমান করে দেয়া। (৩) তিনি কবর চুনা করা, কবরের উপর ঘর তৈরী করা এবং কবরের উপর নাম-ঠিকানা লিখে রাখতে নিষেধ করেন। (৪) যে কবরের পরিচয় রাখতে চায়, তিনি তার উপর এক টুক্‌রা পাথর রেখে দিতে বলতেন। (৫) তিনি কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা এবং কবরের উপর বাতি প্রজ্জ্বলন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন এবং এসব কর্মে লিপ্ত লোকদের প্রতি অভিসম্পাত করেন। (৬) তাঁর আদর্শ ছিল কবরসমূহ অপমানিত বা পদদলিত না করা, কবরের উপর না বসা এবং তার উপর টেক্ না লাগানো এবং উহাকে মহৎ কিছু মনে না করা। (৭) তিনি সাহাবীদের কবর যিয়ারত করতেন তাদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার লক্ষ্যে। আর কবর যিয়ারতকারীর জন্য এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত করেন ঃ

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإنَّا إنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاحِقُوْنَ
نَسْألُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণঃ আস্-সালামু আলাইকুম আহ্লাদ-দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম্ লাহিকূন, নাছ্আলুল্লাহ্ লা-না ওয়া লাকুমুল আফিয়াহ।"-সহীহ্ মুসলিম,-অর্থাৎ, হে কবরের অধিবাসী মু'মিন-মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আর আমরাও ইনশা-আল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত হবো, আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের

জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।' (৮) তাঁর আদর্শ ছিল মাইয়্যেতের শোকার্ত পরিবারকে সান্তনা দেওয়া, কিন্তু সান্তনা প্রদানের জন্য একত্রিত হওয়া এবং মাইয়্যেতের জন্য কবরের পার্শ্বে কিংবা অন্য কোথাও কোরআনখানী করা তাঁর আদর্শ ছিল না। (৯) তাঁর আদর্শ ছিল মাইয়্যেতের পরিবার যেন লোকদের খাবারের আয়োজনের কষ্ট না করে, বরং তিনি লোকদের নির্দেশ প্রদান করেনঃ তারা যেন মাইয়্যেতের শোকার্ত পরিবারের খাবারের আয়োজন করে।"

(৯) যাকাত ও দান-সদকা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ২/৫}

(ক) যাকাত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ-

(১) যাকাতের সময়-সীমা, পরিমাণ ও নেসাব এবং যাকাত কার উপর ফরয হবে এবং যাকাতের হকদার কারা ? এসব বিষয়ে তাঁর আদর্শমালা সর্বাধিক পুর্ণাঙ্গ, যাতে ধনী-দরিদ্র উভয়ের কল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে এবং ধনীদের সম্পদে সেই পরিমাণ যাকাত ফরয করা হয়েছে যদ্বারা ফকীরের প্রয়োজন পুরণ হয় কারো প্রতি অবিচার করা ছাড়া। (২) যখন তিনি কোন ব্যক্তিকে যাকাতের হকদার বলে জ্ঞাত হতেন, তখন তাকে যাকাতের মাল হতে প্রদান করতেন, আর অপরিচিত কোন ব্যক্তি যার অবস্থা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত নন তাঁর নিকট যাকাতের মাল চাইলে, তিনি তাকে এ কথা বলার পর প্রদান করতেন যে, যাকাতের মালে ধনী ও সক্ষম উপার্জনকারী ব্যক্তির কোন অংশ নেই। (৩) তাঁর আদর্শ ছিল যাকাতের মাল ধনীদের থেকে সংগ্রহ করে সে দেশের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা, অতঃপর কিছু অতিরিক্ত হলে তাঁর নিকট মদীনায় নিয়ে আসলে তিনি তা বন্টন করে দিতেন। (৪)

তিনি শুধু প্রকাশ্য মাল যথা চতুষ্পদ জন্তু ও জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের যাকাত সংগ্রহ করার জন্যে দূত প্রেরণ করতেন। (৫) তিনি উৎপাদিত শস্যের অনুমান করার জন্যে লোক প্রেরণ করতেন, যিনি খেঁজুর বাগানের খেঁজুর ও আঙ্গুরের লতায় আঙ্গুর অনুমান করতো, অতঃপর কত অসক্ব হবে {১ অসক্ব = ৬০ নববী সা', -আর ১ সা' = প্রায় আড়াই কেজী, সুতরাং ৫ অসক্ব = ৭৫০ কেজী নেসাব পূর্ণ হলে।"-অনুবাদক} অনুমান করে সেই পরিমাণ যাকাত নির্ধারণ করতো। (৬) তাঁর আদর্শ ছিল না ঘোড়া-গাধা, খচ্চর এবং ক্রীতদাসের যাকাত গ্রহণ করা, অনুরূপ সব্জী, ফল-ফসলাদি যেগুলো তোল-ওজন করা হয় না এবং গুদামজাত করা হয় না, কিন্তু তিনি আঙ্গুর ও পাকা খেঁজুরের যাকাত সংগ্রহ করতেন, তা তাজা হোক কিংবা শুষ্ক হোক এতে কোন পার্থক্য করেননি। (৭) তাঁর আদর্শ ছিল না মানুষের উত্তম-উত্তম মালগুলো যাকাত হিসেবে নিয়ে নেয়া, বরং তিনি মধ্যম মাল গ্রহণ করতেন। (৮) তিনি সদকা গ্রহণকারী ফকীরকে তার সদকা বিক্রয় করতে নিষেধ করতেন, কিন্তু ধনীর জন্য সদকার মাল ভক্ষন করা জায়েয করেন যদি ফকীর তাকে তা হাদিয়্যাহ স্বরূপ প্রদান করে থাকে। (৯) তিনি কখনো মুসলমানদের সার্থরক্ষার্থে সদকার মাল থেকে পরিশোধ করার শর্তে ঋণ গ্রহণ করতেন, আবার কখনো সদকার মাল তার মালিকদের নিকট হতে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতেন। (১০) কোন ব্যক্তি যাকাতের মাল নিয়ে এলে তিনি তার জন্য এ বলে দোআ করতেনঃ হে আল্লাহ্! তার এবং তার উটের মধ্যে বরকত দান কর।"-সুনানে নাসাঈ, আবার কখনো বলতেনঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ। হে আল্লাহ্! তুমি তার প্রতি রহম কর।" সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম,

(খ) যাকাতুল ফিৎর প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ যাদুল মাআদ ঃ ২/১৮

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা' করে খেঁজুর, যব, পনির ও কিশমিশ হতে সদকায়ে ফিৎর আদায় করা ফরয করেন। {১ নববী সা' = প্রায় আড়াই কেজি।"-অনুবাদক} (২) তাঁর আদর্শ ছিল সদকায়ে ফিৎর ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করা। তিনি ইরশাদ করেনঃ যে কেউ তা ঈদের নামাযের আগে আদায় করে তা হবে মাক্ববূল যাকাতুল ফিৎর, আর যে কেউ তা সালাতের পরে আদায় করে, তা হবে শুধুমাত্র এক প্রকার দান-খায়রাত।"-সুনানে আবূ দাউদ, (৩) তাঁর আদর্শ ছিল সদকাতুল ফিৎর বিশেষভাবে অভাবগ্রস্তদের মাঝে বন্টন করা, অর্থাৎ, তিনি তা যাকাতের হকদার আট প্রকারের উপর বন্টন করেননি।

(খ) নফল সদকা-খায়রাত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ২/২১}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মালিকানায় মানুষের মাঝে সর্বাধিক দানশীল ছিলেন, তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত নেআমতে সন্তুষ্ট হয়ে অধিক কমনা করতেন না এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত নেআমতকে নগণ্য মনে করতেন না। (২) কেউ তাঁর নিকট কোন কিছু চাইলে, তিনি তাকে তা প্রদান করতেন কম হোক কিংবা বেশী হোক। (৩) তিনি দান করে দানগ্রহণকারী অপেক্ষা অধিক খুশী হতেন। (৪) তিনি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি দেখলে তাকে নিজের উপর প্রধান্য দিতেন, কখনো স্বীয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করে, আবার কখনো স্বীয় পোষাক প্রদান করে। (৫) তাঁর উদারতা ও দানশীলতা দেখে তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ নিজেদের উপর কাবু হারাই ফেলতো। (৬) তিনি বিভিন্ন প্রকারের দান-খায়রাত করতেন, কখনো উপহারের মাধ্যমে, আবার কখনো সদকার মাধ্যমে, আবার

কখনো উপঢৌকনের মাধ্যমে, আবার কখনো কোন বস্তু ক্রয় করে বিক্রেতাকে ব্যবসা-পণ্য ও মূল্য উভয়টি দান করে, কখনো তিনি কোন বস্তু ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে তার চেয়ে অধিক পরিশোধ করতেন, আবার কখনো তিনি উপহার গ্রহণ করে তার চেয়ে অধিক প্রতিদান দিতেন।"

(১০) সিয়াম বা রোযা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ ঃ

(ক) রমযানের রোযা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ২/৩০}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখে চাঁদ দেখা কিংবা কোন সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্যবাণী ছাড়া মাহে রমযানের রোযা শুরু করতেন না, নচেৎ শাবান মাসের গণনায় ত্রিশ দিন পূর্ণ করতেন। (২) ৩০ শে শাবানের রাত মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে, তিনি মাহে শাবানকে ৩০ দিন পূর্ণ করতেন এবং সন্দেহের দিন তথা মেঘাচ্ছন্ন শাবানের ৩০ তারিখ মাহে রমযানের প্রথম দিন হওয়ার সন্দেহে সেই দিন রোযা রাখতেন না, আর না তার নির্দেশ দেন। (৩) তাঁর আদর্শ ছিল মাহে রমযানের ২৯ তারিখে রোযা শেষ করা দু'জন লোকের শাওয়ালের চাঁদ দেখার সাক্ষ্যবাণীর মাধ্যমে। (৪) ঈদের নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দু'জন ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করলে তিনি রোযা ছেড়ে দেন এবং সাহাবীদেরকে রোযা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন, অতঃপর দ্বিতীয় দিন সকালে ঈদের সালাত আদায় করেন। (৫) তিনি সূর্যাস্তের সাথে সাথে অনতিবিলম্বে ইফতার করতেন এবং তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন, আর সেহরী খেতেন এবং তজ্জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং সেহরী শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে খেতেন এবং বিলম্ব করে সেহরী খাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। (৬) তিনি সালাত আদায়ের পূর্বে ইফতার করতেন এবং তিনি তাজা-পাকা খেঁজুর দ্বারা

ইফতার করতেন, তা না পেলে শুষ্ক খেঁজুর দ্বারা এবং তাও না পেলে কয়েক ঘোঁট পানি পান করতেন। (৭) তিনি ইফতার শেষে বলতেনঃ- ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ উচ্চারণঃ যাহাবায্ যামায়ু ওয়াব্তাল্লাতিল অরূকু, ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ্।"-সুনানে আবূ দাউদ,-অর্থাৎ, পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীগুলি সিক্ত হয়েছে এবং সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশা-আল্লাহ্। (৮) তাঁর আদর্শ ছিল মাহে রমযানে বিভিন্ন প্রকারের ইবাদত অধিক পরিমাণে করা। মাহে রমযানে জিবরীল (আঃ) তাঁর সাথে পর্যায়ক্রমে কোরআন পাঠদান করতেন। (৯) তাঁর আদর্শ ছিল মাহে রমযানে অধিক পরিমাণে সদকা-খায়রাত, তিলাওয়াতে কোরআন ও যিকর এবং ই'তেকাফ করা। (১০) তিনি রমযানে কতিপয় ইবাদত বিশেষভাবে করতেন যা তিনি অন্য কোন মাসে করতেন না, তিনি কখনো সাওমে বেসাল, অর্থাৎ বিরতিহীন রোযা রাখতেন, কিন্তু সাহাবীদেরকে তা থেকে বারণ করেন, তবে তাদেরকে সেহ্রী খাওয়ার সময় পর্যন্ত বিরতিহীন রোযা রাখার অনুমতি দেন।"

(খ) রোযা অবস্থায় জায়েয-নাজায়েয বিষয়াদি প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালনকারীকে অশ্লীল কথাবার্তা, গালি-গালাজ ও তার প্রত্যুত্তর এবং ঝগড়া-বিবাদ করা হতে বারণ করেন, বরং যদি কেউ তাকে গালি দেয়, তবে সে উত্তরে 'আমি সিয়াম পালনকারী' বলার নির্দেশ দিতেন।"-সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম, (২) তিনি মাহে রমযানে সফরকালে কখনো রোযা রাখেন, আবার কখনো রোযা ছেড়ে দেন, অনুরূপ সাহাবীদেরকে সফরে রোযা রাখা, না রাখা উভয়ের অনুমতি দেন। (৩) তিনি সাহাবীদেরকে রোযা

ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিতেন যখন তারা রণাঙ্গনে শত্রুসেনার নিকটবর্তী হতো। (৪) তাঁর আদর্শ ছিল না কোন দূরত্ব বা সীমা নির্ধারণ করা যা অতিক্রম করার পর রোযাদার রোযা ছাড়বে। (৫) বরং সাহাবীগণ সফর শুরু করলেই রোযা ছেড়ে দিতেন এলাকার ঘর-বাড়ী অতিক্রম করার চিন্তা-ভাবনা ছাড়া এবং তাঁরা বলেনঃ এটা তাঁর আদর্শমালা ও সুন্নাতের অন্তর্গত। (৬) কখনো স্ত্রী সহবাসজনিত অপবিত্র অবস্থায় তাঁর ফজর হয়ে যেতো, তখন তিনি ফজরের পর গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। (৭) তিনি মাহে রমযানে রোযা অবস্থায় কখনো তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। (৮) তিনি রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করতেন এবং রোযা অবস্থায় মায্‌মাযা ও ইস্তিন্‌শাক্ব করতেন এবং রোযা অবস্থায় প্রচণ্ড গ্রীষ্মজনিত তাপ হ্রাস করার লক্ষ্যে স্বীয় মাথার উপর পানি ঢালতেন। (৯) তাঁর আদর্শ ছিল রোযাদার ভুলবশতঃ পানাহার করলে তার থেকে কাযার হুকুম প্রত্যাহার করে রোযা পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া। (১০) তিনি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও মুসাফিরের জন্য রোযা না রেখে পরে কাযা করার অনুমতি দেন, অনুরূপ বিধান গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলাদের জন্য যদি তারা রোযা রাখার দরুন নিজেদের অথবা তাদের শিশুদের ক্ষতির আশংকা বোধ করে থাকে।”

(গ) নফল রোযা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ}

(১) এ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ছিল পূর্ণাঙ্গ ও উদ্দেশ্য হাসিলে শ্রেষ্ঠতম এবং আত্মার উপর সহজতর। তিনি কখনো এতো অধিক রোযা রাখতেন যে, বলা হতোঃ হয়তো তিনি রোযা আর ছাড়বেন না, আবার তিনি রোযা ছেড়ে দিতেন এমনভাবে যে, বলা হতোঃ হয়তো তিনি সহসা আর রোযা রাখবেন না, তিনি মাহে রমযান ব্যতীত অন্য কোন

মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি এবং শা'বান মাস ছাড়া আর কোন মাসে এত অধিক নফল রোযা রাখেননি, আর এমন কোন মাস অতিবাহিত হতো না যে মাসে তিনি অবশ্যই কয়েক দিন রোযা না রাখতেন। (২) তাঁর আদর্শ ছিল শুধু জুমআর দিনে রোযা রাখা অপছন্দ করা এবং তিনি প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার জন্য খুবই সচেষ্ট থাকতেন। (৩) তিনি আইয়ামে বীয তথা প্রতি মাসের - ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখা ছাড়তেন না, না সফরে না গৃহে অবস্থানকালে এবং তিনি আইয়ামে বীযে রোযা রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। (৪) তিনি প্রত্যেক মাসের শুরুতে তিন দিন রোযা রাখতেন। (৫) তিনি শাওয়ালের ছয় রোযা প্রসঙ্গে বলেনঃ রমযানের সাথে শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।"-সহীহ্ মুসলিম, আর তিনি রমযানের পর আশুরার (১০ ই মুহাররামের) দিনের রোযাকে অন্য যে কোন দিনের রোযা অপেক্ষা মহত্ত্বপূর্ণ মনে করতেন। (৬) তিনি আরফার (৯ ই যুলহাজ্জের) দিনের রোযা প্রসঙ্গে বলেনঃ উক্ত রোযা বিগত এক বছরের এবং আগামী এক বছরের পাপরাশিকে মোচন করে দেয়।"-সহীহ্ মুসলিম, তবে তাঁর আদর্শ ছিল আরফার দিন ময়দানে আরফায় অবস্থানকালে রোযা না রাখা। (৭) তাঁর আদর্শ ছিল না সারা বছর রোযা রাখা, বরং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ যে কেউ সারা বছর রোযা রাখলো, প্রকৃতপক্ষে সে না রোযা রাখলো, আর না সে রোযা ছাড়লো।"-সুনানে নিসাঈ, (৮) তিনি কখনো নফল রোযার নিয়্যত করতেন, অতঃপর রোযা ছেড়ে দিতেন, আবার কখনো স্বীয় পরিবারের নিকট এসে জিজ্ঞেস করতেনঃ তোমাদের নিকট কি খাবারের কিছু আছে ? যদি তারা উত্তরে বলতোঃ না, তখন তিনি বলতেনঃ তাহলে আমি সিয়াম পালন করলাম।"- সহীহ্ মুসলিম, (৯) তিনি বলেছেনঃ যদি

তোমাদের কাউকে খাবারের প্রতি আহ্বান করা হয় অথচ সে রোযাদার, তখন সে উত্তরে বলবেঃ আমি সিয়াম পালন করছি।"

(ঘ) ই'তেকাফ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ২/৮২}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে ই'তেকাফ করতেন, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আয্‌যা-ওয়াজাল্লা তাঁকে উঠিয়ে নেন, তিনি একবার ই'তেকাফে ছিলেন না, অতঃপর তা শাওয়ালে কাযা করেন। (২) তিনি 'লাইলাতুল ক্বদর' তালাশ করার লক্ষ্যে একবার প্রথম দশ দিনে ই'তেকাফ করেন, তারপর মধ্যম দশ দিনে, তারপর শেষ দশ দিনে, অতঃপর যখন তিনি জেনে নিলেন যে, 'লাইলাতুল ক্বদর' শেষ দশ দিনে বিদ্যমান, তখন থেকে তিনি সর্বদা শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ করতেন, যতক্ষণ না তিনি আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাগমণ করেন। (৩) তিনি কখনই রোযা ছাড়া ই'তেকাফ করেননি। (৪) তাঁর নির্দেশে মসজিদে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির তাঁবু স্থাপন করা হতো, আর তিনি তাতে নির্জনতা অবলম্বন করতেন। (৫) তিনি ই'তেকাফের ইচ্ছা করলে ফজরের নামাযের পরেই প্রবেশ করতেন। (৬) তিনি ই'তেকাফ করলে তাঁর বিছনা-পাত্র ই'তেকাফস্থলে রাখা হতো এবং তাতে তিনি একলা নির্জেনে প্রবেশ করতেন। (৭) তিনি মানবিক প্রয়োজন ছাড়া ঘরে যেতেন না। (৮) তিনি স্বীয় মাথা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাযিঃ) এর ঘরের দিকে বের করে দিতেন, তখন আয়েশা (রাযিঃ) তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতেন যখন তিনি হায়েয অবস্থায় থাকতেন। (৯) তিনি ই'তেকাফে থাকা অবস্থায় তাঁর কোন কোন স্ত্রী সাক্ষাৎ করতে যেতেন, সাক্ষাৎ শেষে প্রত্যাবর্তন কালে তিনি তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে বের হন, তখন রাত্রিবেলা ছিল। (১০) তিনি ই'তেকাফ থাকা

অবস্থায় তাঁর কোন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতেন না, আর না কোন স্ত্রীকে চুমু ইত্যাদি দিতেন। (১১) তিনি প্রত্যেক বছর দশ দিন করে ই'তেকাফ করতেন, কিন্তু যেই বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সেই বছর বিশ দিন ই'তেকাফ করেন।"

(১১) হজ্জ -ওমরাহ্ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ২/৮৬}

(ক) ওমরাহ্ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ-

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার ওমরাহ্ পালন করেন, (এক) হোদায়বিয়ার ওমরাহ্, যখন মুশরিকরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল, তখন তিনি হোদায়বিয়া নামক স্থানে হাদী যবেহ করেন এবং মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যান। (দুই) ওমরাতুল কাযা, যা তিনি হোদায়বিয়ার সন্ধি মোতাবেক পরবর্তী বৎসর আদায় করেছিলেন। (তিন) যেই ওমরাহ্ তিনি হজ্জের সাথে আদায় করেছিলেন। (চার) তিনি জিয়িররানা থেকে একটি ওমরাহ্ আদায় করেছিলেন, {যা হোনাঈন যুদ্ধের সময় হয়েছিল।} (২) তাঁর জীবনে কোন ওমরাহ্ মক্কা হতে বহির্গমণকালে ছিল না, বরং সবকয়টি ওমরাহ্ ছিল মক্কায় প্রবেশকালে। (৩) বৎসরে একাধিক ওমরাহ্ করা তাঁর থেকে প্রমাণিত নেই, তিনি কখনই এক বৎসরে দু'বার ওমরাহ্ করেননি। (৪) তাঁর সকল ওমরাহ্ আদায় হজ্জের মাস সমূহে ছিল। (৫) তিনি বলেনঃ মাহে রমযানে ওমরাহ্ আদায় হজ্জের সমতুল্য।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম।

(খ) হজ্জ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ২/৯৬}

(১) হজ্জ ফরয হওয়ার পর অনতি বিলম্বে তিনি হজ্জ আদায় করেন এবং তিনি জীবনে একবার মাত্র হজ্জ করেন এবং তা ছিল হজ্জে

ক্বেরান। (২) তিনি যোহরের নামাযের পর হজ্জের এহ্রাম বাঁধেন, অতঃপর তালবিয়া পাঠ করে বলেনঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ

উচ্চারণঃ লাব্বাইকা-আল্লাহুম্মা -লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা-লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নেঅমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা-লাক।"-সহীহ্ মুসলিম, - অর্থাৎ, আমি উপস্থিত হে আল্লাহ্ ! আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত তোমার কোন শরীক-অংশীদার নেই আমি উপস্থিত, নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এবং নেআমতসমূহ তোমার, আর সমূদয় রাজত্ব তোমার, তোমার কোন শরীক নেই।" আর তিনি এই তালবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করেন, যাতে তাঁর সাহাবীগণ শুনতে পান। তিনি তাদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করার নির্দেশ দেন এবং তিনি লাগাতার তালবিয়া পড়তে থাকেন। লোকেরা তাতে কম-বেশী করছিল, কিন্তু তিনি তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেননি। (৩) তিনি এহ্রাম বাঁধার সময় সাহাবীদেরকে হজ্জের তিন প্রকারের যে কোন একটি মনোনীত করার অনুমতি দেন, অতঃপর তিনি মক্কার নিকটবর্তী হলে হজ্জে ইফরাদ ও হজ্জে ক্বেরানকারীদের মাঝে যাদের সাথে হাদী-কোরবানীর পশু ছিল না তাদেরকে হজ্জের এহরামের বদলে ওমরার নিয়্যাত করার উৎসাহ প্রদান করেন। (৪) তিনি উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার হয়ে হজ্জ আদায় করেন, পাল্কি কিংবা হাওদা-ডুলীর মধ্যে নয় এবং খাদ্যদ্রব্য ও সফরের সামান তাঁর সাথেই ছিল। (৫) তিনি মক্কায় উপনীত হয়ে এ মর্মে নির্দেশ জারী করেন যে, যাদের সাথে হাদী-কোরবানীর পশু নেই তারা যেন হজ্জের এহ্রাম ভঙ্গ করে ওমরার নিয়্যাত করে এবং ওমরাহ্ আদায়ের পর এহরাম থেকে হালাল হয়ে যায়, আর যাদের সাথে হাদী রয়েছে তারা যেন ওমরাহ্ আদায়ের পর এহরাম অবস্থায় থাকে, অতঃপর তিনি

সওয়ারীতে আরোহন করে 'যিতুয়া' নামক উপত্যকায় অবতরণ করেন এবং সেখানে মাহে যিল হাজ্জার চতুর্থ তারিখ রবিবারের রাত কাটান এবং সেখানে ফজরের নামায আদায় করেন। অতঃপর গোসল করে দিনের বেলায় মক্কার হুজ্জুনের দিকে অবস্থিত 'সানিয়াতুল উলইয়া'-নামক এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করেই বায়তুল্লাহর অভিমুখে রাওনা হন, তখন তিনি তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়েননি এবং হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে তাকে স্পর্শ করেন এবং তার উপর ভীড় করেননি। অতঃপর বায়তুল্লাহ্‌কে বামে রেখে ডান পার্শ্ব দিয়ে তাওয়াফ শুরু করেন এবং কা'বার দরজায় কিংবা মীযাবের নিচে অথবা কা'বা ঘরের পিছনে কিংবা চার কোনে কোন নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করেননি। তবে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছে এই আয়াতটি পাঠ করা তাঁর থেকে প্রমাণিত রয়েছে ঃ- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ্, ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাহ্,ওয়াক্বিনা-আযাবান্নার,-অর্থাৎ, "হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর।" এটা ছাড়া তাওয়াফের জন্যে আর কোন নির্দিষ্ট দোআ নির্ধারণ করেননি এবং তিনি এই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করেন -অর্থাৎ, ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলেন এবং এই তাওয়াফে 'ইযতিবা' করেন -অর্থাৎ, পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডান কাঁধের নীচ দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করেন এবং ডান বাহু ও ডান কাঁধ খোলা রাখেন। যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হতেন তখন 'আল্লাহু আকবর' বলে তার প্রতি ইশারা করতেন কিংবা হাতের ছড়ি দিয়ে স্পর্শ করতেন

এবং ছড়িকে চুম দিতেন। আরবী শব্দ 'মেহ্জন' মানে মাথা বাঁকা হাতের ছড়ি, আর রুকনে ইয়ামানীর নিকট পৌঁছে উহাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করেন কিন্তু তাকে চুম দেননি, আর স্পর্শ করার পর হাতেও চুম দেননি, অতঃপর তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহিমের পিছনে এসে এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ-

وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى

অর্থাৎ, "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"-সূরা বাক্বারাহ,আঃ ১২৫, এবং সেখানে দু'রাকাত নামায আদায় করেন তখন মাক্বামে ইবরাহিমী তাঁর ও বায়তুল্লাহর মধ্যস্থলে ছিল, উক্ত দু'রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ইখলাসের সূরাদ্বয় তথা 'কুল ইয়া ইয়ুহাল কাফিরূন এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করেন, নামায শেষে হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হয়ে তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করেন, অতঃপর সাফা পাহাড়ের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সাফার নিকটবর্তী হলে এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ-

۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

অর্থাৎ, " নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্ত র্গত, সুতরাং যে ব্যক্তি কা'বা ঘরের 'হজ্জ' অথবা উমরা' পালন করে, তার জন্যে এতদুভয়ের মাঝে 'সাঈ' করা দূষণীয় নয়, বরং কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমলের সঠিক মূল্যায়নকারী, মহাজ্ঞানী।"-সূরা বাক্বারাহ্,আঃ ১৫৮, তিনি বলেনঃ আমি সেখান -সাফা-

থেকেই আরম্ভ করবো যেখান থেকে আল্লাহ্ আরম্ভ করেছেন, অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করেন যেখন থেকে তিনি বায়তুল্লাহ্ দেখতে পান, তখন তিনি ক্বেবলামুখি হয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেন এবং তাকবীর বলে এ দু'আ পাঠ করেন ঃ

لا إلهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -
لا إلهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ أنجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন-ক্বাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু আনজাযা ওয়াদাহ্, ওয়া নাসারা আব্দাহ, ওয়া হাযামাল আহযাব ওয়াহদাহ।"-সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, -অর্থাৎ, "আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও একক তাঁর কোন শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও একক, তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই শত্রু সৈন্যদলকে পরাজিত করেছেন।" অতঃপর তিনি দু'আ করেন এবং তিনি অনুরূপ তিনবার করতঃ মারওয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। অতঃপর দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমভূমিতে পৌছে দৌড়ে -দ্রুত গতিতে উপত্যকা অতিক্রম করেন, আর তা হলো দুই সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থান, তিনি পায়ে হেটে সায়ী শুরু করেন, কিন্তু তাঁর উপর লোকদের অধিক ভীড় হলে তিনি সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে সায়ী পূর্ণ করেন। আর তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌছে তার উপরাংশে আরোহণ করেন, তখন তিনি ক্বেবলামুখি হয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেন এবং তাকবীর বলেন এবং অনুরূপ করেন যেরূপ তিনি করেছিলেন সাফা পাহাড়ের উপর, তারপর যখন

সপ্তম চক্করে মারওয়ার নিকটে সায়ী সমাপ্ত করেন, তখন তিনি জরুরীভিত্তিতে নির্দেশ জারী করেন যে, যাদের সাথে হাদী-কোরবানীর পশু নেই তারা যেন এহরাম থেকে পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যায়, যদিও সে হজ্জে কেরান কিংবা ইফরাদের নিয়্যাত করে থাকে। আর যেহেতু তাঁর সঙ্গে হাদী ছিল, তাই তিনি এহরাম থেকে হালাল হননি এবং বলেনঃ যদি আমি আগে জানতাম যা পরে জেনেছি, তবে আমি হাদী-কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না, বরং হজ্জের এহরামকে ওমরার দ্বারা পরিবর্তন করে দিতাম।"-সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম, আর তিনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্যে তিনবার দোআ করেন এবং চুল খাটোকারীদের জন্যে একবার। তিনি মক্কায় অবস্থানকালে জিল-হাজ্জ মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত তাঁর বাসস্থানে নামাযসমূহ জামাআতের সাথে কসর করে আদায় করেন, তারপর তিনি ৮ তারিখের সকালে সাথীদেরকে নিয়ে মিনা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং যারা এহরাম থেকে হালাল হয়ে গিয়ে ছিল তারা নিজ নিজ বাসস্থান থেকেই হজ্জের এহরাম বাঁধেন, তারপর মিনায় পৌছে যোহর ও আসরের নামায নির্দিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন। ৯ তারিখের সূর্যোদয়ের পর আরাফা অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন সাহাবীদের কেউ তালবীয়াহ্ পাঠ করছিল, আবার কেউ তাকবীর বলছিল, তিনি তা শুনছিলেন কিন্তু কারো উপর অসম্মতি প্রকাশ করেননি। অতঃপর নামিরায়ে পৌছে তিনি একটি গোলাকৃতির তাবুতে প্রবেশ করেন - যা তাঁর নির্দেশে তাঁর জন্যে স্থাপন করা হয়েছিল, মূলতঃ নামিরাহ্ নামক স্থান আরাফার অন্তর্গত নয়, বরং সেটি আরাফার পশ্চিমপ্রান্তে একটি এলাকার নাম। সূর্য ঢলা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন, তারপর স্বীয় 'ক্বাসওয়া' নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে ওরানাহ্ নামক উপত্যকায় গমণ করেন এবং স্বীয়

উষ্ট্রীর উপর বসে একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন যাতে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং শিরক ও জাহিলীয়্যাতের ভিত্তিসমূহ ধ্বসিয়ে দেন এবং যেসব বিষয়াবলী সকল ধর্ম ও মিল্লাতে হারাম সেগুলোর নিষিদ্ধতার উপর তাকীদ প্রদান করেন এবং জাহিলী যুগের কুসংস্কার ও সুদকে নিজের পায়ের নিচে রাখেন, সেই খুৎবায় জনগণকে মহিলাদের প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দেন। কোরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়তার সাথে অবলম্বন করে চলার অসিয়াত করেন, তারপর তিনি সাহাবীদের থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আমানত সম্পূর্ণরূপে আদায় করেছেন এবং উম্মতকে নসীহত করেছন, অতঃপর উক্ত স্বীকারোক্তির উপর আল্লাহকে সাক্ষী রাখেন। তারপর খোৎবা শেষে বেলাল (রাযিঃ)-কে আযানের নির্দেশ দিলে তিনি আযান ও ইকামত দেন। তখন তিনি যোহরের নামায কসর করে দু'রাকাত আদায় করেন এবং তাতে নিম্নস্বরেঃ কেরাত পড়েন অথচ সেই দিন শুক্রবার ছিল। তারপর ইকামত দিয়ে আসরের নামায দু'রাকাত আদায় করেন। অথচ তখন তাঁর সঙ্গে মক্কার অধিবাসীগণও ছিল, কিন্তু তিনি তাদেরকে যোহর-আসরের নামায চার রাকাত পূর্ণ করার দির্দেশ দেননি, আর না তাদেরকে 'জম্‌আ-তাকদীম' না করার হুকুম দেন। অতঃপর নামায শেষে তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করে আরাফাতের সীমার মধ্যে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে গমণ করেন। আরাফার দিন তাঁর রোযা রাখার ব্যাপারে লোকদের মাঝে সন্দেহ দেখা দিলে উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ (রাযিঃ) তাঁর নিকট একটি পাত্রে সদ্য দোহন করা দুধ পাঠিয়ে দেন, তখন তিনি আরাফায় অবস্থানরত ছিলেন - তিনি তা পান করেন এবং লোকগণ তা দেখতে ছিল। তিনি 'জাবালে রহমত' নামক পাহাড়ের

নিচে পাথর সমূহের নিকট 'জাবালে মুশাত'-কে সম্মুখে রেখে কি্বলামুখী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি স্বীয় উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার ছিলেন এবং তিনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোআ-প্রার্থনা ও কাঁন্না-কাটি করতে থাকেন, তিনি লোকদেরকে 'ওরানাহ্' নামক উপত্যকায় অবস্থান না করার নির্দেশ দেন এবং বলেনঃ আমি এখানে অবস্থান করছি, তবে আরাফার প্রান্তর সবই অবস্থানস্থল।"-সহীহ্ মুসলিম, তখন তিনি দোআ করার সময় ভিখারীর ন্যায় সীনা মুবারক পর্যন্ত হাত উত্তোলন করেন এবং ইরশাদ করেনঃ শ্রেষ্ঠতম দোআ হলো আরাফার দিনের দু'আ, আর আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম বাণী হলোঃ

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।"-সুনানে তিরমিযী, আর যখন আরাফার দিনে সূর্যাস্ত হয়ে যায় এবং সুর্যাস্তের ব্যাপারটি নিশ্চিত হয় এভাবে যে, সূর্যের সোনালী রং শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি ওসামা বিন যায়েদ (রাযিঃ)-কে সাওয়ারীর পিছনে আরোহণ করে ধীরস্থিরতার সাথে মুযদালিফার দিকে যাত্রা করেন এবং তিনি উষ্ট্রীর লেগাম নিজের দিকে টেনে রেখেন এমনভাবে যে, উহার মাথা সওয়ারীর কিনারায় যেন যোগ করছিলেন এবং তিনি বলছিলেনঃ "হে লোক সকল! তোমরা প্রশান্তি ও ধীরস্থিরতার সাথে চলো, কেননা সৎকর্ম তাড়াহুড়া করার মধ্যে নয়।"-সহীহ্ বোখারী, এবং তিনি 'আল-মা'যেমাঈন' নামক রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিনি 'তারীক্ব-যাব্ব' নামক রাস্তা দিয়েই আরাফায় প্রবেশ করেছিলেন, আর প্রত্যাবর্তন কালে তাঁর চলার গতি ছিল মধ্যম, কিন্তু যখন কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কিংবা ফাঁকা পথে উপনীত হতেন তখন দ্রুত গতিতে চলতেন এবং তিনি পথ অতিক্রম

কালে লাগাতার তালবিয়া পাঠ করছিলেন। তিনি পথিমধ্যে অবতরণ করে পেশাব করেন, তারপর হাল্কা অযু করে পথ চলেন এবং মাগরিবের নামায পড়েননি যতক্ষণ না তিনি মুযদালিফায় পৌছেন। অতঃপর মুযদালিফায় পৌছে নামাযের জন্য অযু করেন এবং বিলাল (রাযিঃ)-কে আযান ও ইকামতের নির্দেশ দেন। অতঃপর উষ্ট্রীর পিঠ হতে মাল-সামান রাখার এবং উটের পাল বাঁধার পূর্বেই মাগরিবের নামায তিন রাকাত আদায় করেন, অতঃপর লোকসকল নিজ নিজ জায়গায় নিজেদের উট বসিয়ে দিলে আযান ছাড়া শুধু ইকামত দিয়েই এশার নামায কসর করে আদায় করেন এবং মাগরিব ও এশার মাঝে তিনি আর কোন নামায পড়েননি। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন ফজর পর্যন্ত এবং সেই রাত জাগ্রত থাকেননি, তবে অর্ধরাত্রি যাপন করার পর পরিবারের দূর্বল লোকদেরকে মিনার দিকে যাত্রা করার অনুমতি প্রদান করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন জমরাতে কংকর নিক্ষেপ না করে যতক্ষণ না সূর্যোদিত হয়। অতঃপর ফজরের সময় হলে আযান ও ইকামত দিয়ে প্রথম ওয়াক্তেই ফজরের নামায আদায় করেন। তারপর সাওয়ারীতে আরোহণ করে মাশআরে হারামের নিকট গমণ করেন এবং লোকদের লক্ষ্য করে বলেনঃ “পুরো মুযদালিফাই অবস্থানস্থল।”-সহীহ্ মুসলিম, তখন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে অধিক হারে আল্লাহর যিকর, তাক্বীর, তাহ্‌লীল, দোআ-প্রার্থনা ও কাঁন্না-কাটি করতে থাকেন যে পর্যন্ত না প্রভাতের আলো অনেকটা ফর্সা হয়ে উঠে। অতঃপর সূর্যোদয়ের আগেই ফযল ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-কে সাওয়ারীর পিছনে বসায়ে মুযদালিফা হতে মিনার দিকে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, তিনি জামরাতে নিক্ষেপ করার জন্য সাতটি কংকর বেছে নেন এবং তিনি সেগুলোতে ফুৎকার

করতে করতে বলেনঃ "তোমরা জমরাতে অনুরূপ ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করো এবং ধর্মে অতিরঞ্জন করা হতে সতর্ক থাকো।"-সুনানে নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্, আর তিনি 'মুহাস্সর' নামক উপত্যকায় পৌঁছলে দ্রুত গতিতে তা অতিক্রম করেন। আর তিনি মধ্যম পথ দিয়ে চলেন যেটি সোজা জমরাতুল কোবরায় নিয়ে যায়। তিনি কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করছিলেন। তিনি সূর্যোদয়ের পর উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার অবস্থায় উপত্যকা হতে জামরাতুল আকাবা বা বড় জমরাতে পর পর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তখন তিনি কা'বা শরীফকে বাম দিকে এবং মিনাকে ডান দিকে রাখেন এবং প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু-আকবর'-তাকবীর বলেন। অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করে একটি মাহত্ম্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন, যাতে কোরবানীর দিনের ফযীলত এবং মক্কার মান-মর্যাদা সম্পর্কে লোকদের অবহিত করেন এবং শাসকবর্গের যারা কোরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা নেতৃত্ব দেয় তাদের কথা শোনা ও মান্য করার নির্দেশ দেন। তাদেরকে হজ্জের বিধি-বিধান শিক্ষা দেন, তারপর মিনায় পশু যবেহ্ করার স্থানে গমণ করে নিজ হতে ৬৩ টি মোটা-তাজা উট কোরবানী করেন, উট যবেহ্ করার সময় সেগুলি দাঁড়ানো এবং বাম-পা বাঁধানো অবস্থায় ছিল, অতঃপর এক শত উটের অবশিষ্টগুলিকে যবেহ্ করার জন্য আলী (রাযিঃ)-কে নির্দেশ দেন। কোরবানীর পশুর গোশ্ত অভাবগ্রস্থ-দরিদ্র লোকদের মাঝে বন্টন করে দিতে বলেন। কিন্তু কসাইকে তার মজদুরী হিসেবে কোরবানীর গোশ্ত দিতে নিষেধ করেন, তিনি আরো বলেনঃ পুরো মিনাই কোরবানীরস্থল এবং মক্কার গিরিপথসমূহ রাস্তা ও কোরবানীরস্থল। অতঃপর কোরবানীর পশু যবেহ্ করা শেষে নাপিতকে ডেকে পাঠান, নাপিত প্রথমে তাঁর মাথার ডান অর্ধাংশ মুন্ডন করলে তিনি তা আবূ ত্বালহা (রাযিঃ)-কে

প্রদান করেন, অতঃপর বাম অর্ধাংশ মুণ্ডন করলে তিনি চুলগুলো আবূ ত্বালহা (রাযিঃ)-কে দিয়ে বলেনঃ "এগুলি জনগণের মাঝে বন্টন করে দাও।"-সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম। তিনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্যে তিনিবার দু'আ করেন এবং চুল খাটোকারীদের জন্যে একবার, তখন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাযিঃ) তাঁকে খুশবু মাখিয়ে দেন। অতঃপর যোহরের আগে সাওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাওয়াফে ইফাযাহ্ বা ফরয তাওয়াফ আদায় করেন। সেদিন অন্য কোন তাওয়াফ করেননি এবং তাওয়াফের সাথে সায়ীও করেননি, (কেননা ক্বারেন হাজীর জন্য তাওয়াফে ওমরাহ্ ও তাওয়াফে ইফাযাহ্ এবং একটি সায়ী যথেষ্ট, আর বিদায়ী তাওয়াফ তো ঋতুবর্তী মহিলা ছাড়া বহিরাগত সকল হাজীদের উপরই ওয়াজিব।"-অনুবাদক) তিনি ফরয তাওয়াফ কিংবা বিদায় তাওয়াফে 'রমল' করেননি, বরং শুধুমাত্র তাওয়াফে কুদুমে 'রমল' করেন, অতঃপর তাওয়াফ শেষে যম্‌যমের নিকট আসেন তখন লোকেরা পানি পান করছিল, লোকেরা তাঁকে পানির পাত্র উঠিয়ে দিলে তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় যম্‌যমের পানি পান করেন। অতঃপর মিনায় ফিরে আসেন এবং মিনাতেই রাত্রি যাপন করেন। সেদিন যোহরের নামায কোথায় আদায় করেন, এ মর্মে মতানৈক্য রয়েছে, ইবনে ওমর (রাযিঃ) এর বর্ণনায় তিনি সেদিন যোহরের নামায মিনাতে পড়েন, আর জাবের ও উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাযিঃ) বলেনঃ তিনি সেদিন যোহরের নামায মক্কাতেই পড়েন। অতঃপর ১১ তারিখের সকালে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার অপেক্ষা করেন, অতঃপর সূর্য ঢলার পর তিনি তাবু থেকে জমরাত অভিমুখে পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন এবং সেদিন সাওয়ারীতে আরোহণ করেননি, সেথায় পৌঁছে প্রথমে মসজিদে খাইফের সন্নিকটে অবস্থিত প্রথম জমরাতে কংকর মারা শুরু করেন এবং তাতে একের পর

এক সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রত্যেক কংকরের সাথে 'আল্লাহু আকবর'-তাকবীর বলেন। তারপর কিছুটা অগ্রসর হয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত উত্তোলন করে সূরা বাক্বারার সমপরিমাণ দীর্ঘক্ষণ দু'আ-প্রার্থনা করেন। তারপর মধ্যম জমরায় পৌছে সেখানেও প্রথমবারের ন্যায় কংকর নিক্ষেপ করেন, তারপর কিছুটা সম্মুখে উপত্যকার দিকে সরে গিয়ে জমরাকে ডান দিকে রেখে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে প্রায় প্রথমবারের ন্যায় দীর্ঘক্ষণ দু'আ-প্রার্থনা করেন। তারপর তৃতীয় জম্‌রাতুল আক্বাবার প্রতি অগ্রসর হন এবং সেখানে পৌছে বাম দিকে উপত্যকা সংলগ্ন স্থানে গমন করেন এবং জম্‌রাকে সামনে রেখে এবং কা'বা শরীফকে বাম দিকে এবং মিনাকে ডান দিকে রাখে অনুরূপ সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন, আর কংকর নিক্ষেপ সম্পন্ন করে ফিরে আসেন এবং সেথায় দাঁড়াননি। অধিক ধরণা হলো যে, তিনি যোহরের নামাযের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর ফিরে এসে নামায আদায় করেন। তবে আব্বাস (রাযিঃ)-কে হাজীদের পানি সরবরাহ করার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মিনার দিনগুলোতে মক্কায় রাত কাটানোর অনুমতি দেন। তিনি তাড়াতাড়ি করে ১২ তারিখে মিনা ত্যাগ করেননি, বরং বিলম্ব করে 'আইয়্যামে তাশরীক্বের তিন দিনই জম্‌রাতগুলোতে কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর মুহাস্‌সাব উপত্যকায় এসে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায আদায় করেন এবং অল্প কিছু সময় নিদ্রা যান। অতঃপর সাওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কা পৌছে রাত সেহেরীর সময় বায়তুল্লাহর বিদায়ী তাওয়াফ করেন এবং এ তাওয়াফে 'রমল' করেননি, তখন উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যাহ্ ঋতুবর্তী হয়ে পড়লে তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফের হুকুম শিথিল করেন, তাই তিনি বিদায় তাওয়াফ করেননি। সে রাতেই আয়েশার (রাযিঃ)

মনতুষ্ঠির জন্য তাঁর ভাই আব্দুর রাহমানকে সাথে নিয়ে 'তান্‌য়ীম' হতে এহ্‌রাম বেঁধে একটি ওমরাহ্ আদায় করেন। আয়েশা ওমরাহ্ শেষে রাতে ফিরে এলে তিনি সহাবীদেরকে সফরের নির্দেশ দেন, তখন সবাই মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন।"

(১২) হাদী, কোরবানী ও আকীকাহ্ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ২/২৮৫}

(ক) হাদী প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ- মক্কার হেরম শরীফে কোরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট পশুকে হাদী বলা হয়।"-অনুবাদক} (১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট ও ছাগলপাল হাদী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে হাদী হিসেবে গরু প্রেরণ করেন। তিনি হজ্জ ও ওমরার সময় এবং (হোদায়বিয়ার সন্ধি কালে) অবস্থান স্থলে হাদী জবেহ্ করেন। (২) তাঁর আদর্শ ছিল হাদী হিসেবে প্রেরিত ছাগলপালের গলায় বেড়ী লাগানো, সেগুলোর গলায় ছুরির আঘাতে দাগ করা নয়। তিনি স্বীয় হাদী প্রেরণের পর (এহরাম বাঁধার পূর্বমূহূর্ত পর্যন্ত) কোন হালাল বিষয়াদিকে নিজের উপর হারাম মনে করেননি। (৩) তিনি হাদী হিসেবে উট প্রেরণ করলে সেগুলিকে 'তাক্বলীদ'-গলায় বেড়ী লাগাতেন, বা 'এশআর' করতেন -অর্থাৎ, উটের ডান কুজেঁ ছুরির আঘাতে সামান্য দাগ লাগাতেন। (৪) তিনি হাদী প্রেরণ করার সময় দূতকে বলে দিতেন যে, কোন হাদী মৃত্যুমুখী হলে সেটি জবেহ্ করে দেবে, অতঃপর তার রক্তে স্বীয় জুতা রঙ্গিন করে তার উপরিভাগে রেখে দেবে, সে নিজে কিংবা সাথীবর্গের কেউ সে পশুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করবে না, অতঃপর গোশ্‌ত অন্য লোকদের মাঝে বন্টন করে দেবে। (৫) তিনি হাদীতে সাহাবীদের অংশীদার করে দিতেন, উটে সাত ভাগ এবং গরুতে সাত

ভাগ। (৬) তিনি রাখালকে বিশেষ প্রয়োজনে অন্য সওয়ারী পাওয়া পর্যন্ত হাদীতে আরোহণ করার অনুমতি দেন। (৭) তাঁর আদর্শ ছিলঃ উটকে দাঁড়ানো ও বাম-পা বাঁধানো অবস্থায় নহর করা, তিনি নহর করার সময় 'বিসমিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবর' বলতেন। (৮) তিনি নিজ হাতেই কোরবানীর পশু জবেহ্ করেন, আবার কখনো অন্যকে অবশিষ্টগুলি জবেহ্ করার দায়িত্ব প্রদান করেন। (৯) তিনি ছাগল-দুম্বা জবেহ্ করার সময় তাঁর এক পা দিয়ে ছাগল-দুম্বার পাঁজর দাবিয়ে রাখতেন, অতঃপর 'বিসমিল্লাহি-আল্লাহু আকবর' বলে জবেহ্ করেন। (১০) তিনি উম্মতকে কোরবানী ও হাদীর গোশ্ত খাওয়া ও জমা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। (১১) তিনি কখনো হাদীর গোশ্ত বন্টন করে দিতেন, আবার কখনো বলেনঃ যার ইচ্ছা কিছু অংশ রেখে দেবে। (১২) তাঁর আদর্শ ছিল ওমরার হাদী জবেহ্ করা মারওয়া পাহাড়ের নিকটে, আর হজ্জে কেরানের হাদী জবেহ্ করা মিনাতে। (১৩) তিনি কখনই এহরাম হতে হালাল হওয়ার পূর্বে স্বীয় হাদী নহর করেননি, বরং তিনি শুধুমাত্র সূর্যোদয়ের পর এবং জমরাতে কংকর নিক্ষেপের পরই হাদী নহর করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে হাদী নহর করার অনুমতি দেননি।"

(খ) কোরবানী প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ২/২৮৯}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই কোরবানী করা পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি দু'টি দুম্বা দিয়ে কোরবানী করতেন এবং ঈদের নামাযের পর সেগুলো জবেহ্ করতেন। তিনি বলেনঃ আইয়্যামে তাশরীক্ব তথা ১১, ১২, ১৩ তারিখও কোরবানীর দিবস।"-মুসনদে আহমদ, (২) তিনি আরো বলেনঃ যে কেউ ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করলো, তার কোরবানী বলতে কিছুই হলো না, বরং সেটা

কেবল খাবার গোশ্ত হলো, যা সে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য আগাম ব্যবস্থা করলো।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, (৩) তিনি ছাগল - মেষ জাতীয় পশুর ছয় মাসের ছানা এবং পাঁচ বছর উত্তির্ণ উট, আর দু'বছর উত্তির্ণ গরু কোরবানী করার নির্দেশ দেন। (৪) তাঁর আদর্শ ছিল কোরবানীর জন্য সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত পশু বাচাই করা। তিনি কান-কাটা, শিং-ভাঙ্গা, এক চোখ-কানা, নেংড়া, পা-ভাঙ্গা ও অতি দূর্বল পশু দিয়ে কোরবানী করতে নিষেধ করেন এবং তিনি চোখ-কান ত্রুটিমুক্ত হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করার নির্দেশ দেন। (৫) তিনি আরো নির্দেশ দেন, যে ব্যক্তি কোরবানী করার ইচ্ছা রাখে সে যেন যিল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশক প্রবেশের পর নিজের নখ-চুলের কিছুই না কাটে। (৬) তাঁর আদর্শ ছিল ঈদগাহে কোরবানী করা।"-সহীহ্ বোখারী, (৭) তাঁর আদর্শ ছিল একটি ছাগল এক পরিবারের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে বলে মনে করা, যদিও সংখ্যায় তারা একাধিক হয়ে থাকে।"

(গ) আক্বীকা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ২/২৯২}

(১) সহীহ্ সনদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেনঃ প্রত্যেক নবজাত শিশু তার আক্বীকার সাথে দায়বদ্ধ থাকে, যেটি তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে জবেহ্ করা হয় এবং তার মাথা-মুণ্ডণ করা হয় ও নাম রাখা হয়।"-সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ, (২) তিনি আরো বলেছেনঃ ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবেহ্ করা হবে।"-সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে নাসাঈ,

(১৩) ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ১/১৫৪}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয় ও বিক্রয়

করেন, তবে নবুওয়াত লাভের পর তাঁর ক্রয় অধিক ছিল বিক্রয় অপেক্ষা, তিনি {মক্কায় কয়েক কীরাতের বিনিময়ে ছাগল-ভেড়া চরানোর} মজুরী করেন এবং অন্যকে মজুর নিয়োগ করেন, তিনি উকীল-প্রতিনিধি নিয়োগ করেন এবং অন্যের প্রতিনিধিত্ব করেন, তবে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ অধিক ছিল তাঁর প্রতিনিধিত্ব করা অপেক্ষা। (২) তিনি নগদ মূল্যে ও বাকী মূল্যে ক্রয় করেন, তিনি নিজে সুপারিশ করেন এবং তাঁর নিকট সুপারিশ করা হয়, তিনি বন্ধক দিয়ে এবং বন্ধক ছাড়া ঋণ গ্রহণ করেন এবং তিনি ধার নেন। (৩) তিনি দান-খায়রাত করেন এবং দান গ্রহণ করেন, তিনি নিজে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেন এবং উপহার গ্রহণ করেন এবং তার প্রতিদান প্রদান করেন, আর উপহার গ্রহণের ইচ্ছা না হলে প্রদানকারীর নিকট অপারগতা প্রকাশ করেন, রাজা-বাদশাগণ তাঁর নিকট হাদীয়া-উপঢৌকন প্রেরণ করতো, তিনি তাদের হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তা সাহাবীদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। (৪) তাঁর লেন-দেন সর্বাধিক উত্তম ছিল, তিনি কারো থেকে কিছু ঋণ হিসেবে গ্রহণ করলে তার চেয়ে উত্তম পরিশোধ করতেন এবং তার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের জন্য বরকতের দোআ করতেন, তিনি একবার ঋণ হিসেবে একটি উট গ্রহণ করেন, অতঃপর তার মালিক কর্কশ ভাষায় তাঁর নিকট মূল্য পরিশোধের দাবী করলে সাহাবীগণ তাকে মার-ধর করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেনঃ তাকে ছেড়ে দাও, কেননা হকদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে।"-সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম, (৫) অজ্ঞ-মূর্খদের কঠোরতা তাঁর ধৈর্য্য-ক্ষমাশীলতাকে আরো বৃদ্ধি করতো, তিনি রাগান্বিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, সে যেন নিজের রাগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে অযুর পানির দ্বারা নিবিয়ে ফেলে এবং বসে পড়ে যদি সে দাঁড়ানো থাকে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয়

প্রার্থনা করে। (৬) তিনি কারো উপর গর্ব-অহংকার করতেন না, বরং সাথীদের সামনে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করতেন এবং ছোট-বড় সবাইকে সালাম দিতেন। (৭) তিনি কখনো কৌতুক ও রসিকতা করতেন, তবে তিনি কৌতুক ও রসিকতায় সত্য বলতেন, তিনি কখনো 'তাওরিয়া' বা ইঙ্গিতে কথা প্রকাশ করতেন, তবে তিনি তাতে সত্য ছাড়া বলতেন না। (৮) তিনি একদা নিজেই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন, নিজ হাতেই জুতা সেলাই করেন, নিজ হাতেই কাপড় বহন করেন, পানির ঢোলে তালি লাগান, ছাগলের দুধ দোহন করেন, কাপড় সেলাই করেন, নিজের ও পরিবার-পরিজনের খেদমত করেন এবং সাহাবীদের সঙ্গে মসজিদ নির্মাণ কাজে ইট বহন করেন। (৯) তাঁর বক্ষ কল্যাণের জন্য সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক উন্মুক্ত ছিল, তাঁর অন্তর সর্বাধিক পবিত্র ছিল। (১০) তাঁকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হলে তিনি সর্বদাই অপেক্ষাকৃত সহজতরটি গ্রহণ করতেন, যদি না হয় তা গুনাহর বিষয়। (১১) তিনি ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তবে আল্লাহর বিধান লংগিত হলে শুধু আল্লাহর জন্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (১২) তিনি পরামর্শ দিতেন এবং পরামর্শ গ্রহণ করতেন, রোগীর দেখা-শোনা করতেন এবং জানাযায় শরীক হতেন, লোকদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন এবং বিধবা, অভাবগ্রস্থ দূর্বলদের অভাব পূরণের লক্ষ্যে তাদের সাথে হেঁটে যেতেন। (১৩) কেউ তাঁকে পছন্দনীয় কোন বস্তু উপহার দিলে তিনি তার জন্য দু'আ করতেন এবং বলেছেনঃ যে কেউ কারো প্রতি সদাচরণ করলো, অতঃপর সে ঐ আচরণকারীকে বললোঃ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا জাযাকা-ল্লাহু খাইরা ;-অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুক, তাহলে সে তার অত্যধিক প্রশংসা করেছে।"-সুনানে তিরমিযী,

(১৪) বিবাহ-শাদী ও পারিবারিক জীবন-যাপন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/১৪৫}

(১) সহীহ্ সনদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেনঃ দুনিয়ার বস্তুসমূহ হতে নারী ও সুগন্ধিকে আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে এবং নামাযের মধ্যে আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে, তিনি আরো বলেছেনঃ হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে সাধ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, তিনি আরো বলেছেনঃ তোমরা অত্যধিক মমতাময় ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারী বিবাহ করো।"-সুনানে আবূ দাউদ, (২) তাঁর আদর্শ ছিল স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার ও মহৎ চরিত্রময় জীবন-যাপন করা। তিনি বলতেনঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে, নিজের পরিবারের নিকট সর্বোত্তম, আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চেয়ে সর্বোত্তম।"-সুনানে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, (৩) স্ত্রীদের কেউ অবৈধ নয় এমন কোন বিষয় কামনা করলে, তখন তিনি তার সে বাসনা পূরণ করতেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাযিঃ) নিকট আনসারী মেয়েরা গোপনে প্রবেশ করতেন, যারা তাঁর সাথে খেলা-ধুলা করতো। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাযিঃ) পান করার পর তিনি পাত্র হাতে নিয়ে সেই স্থানে মুখ রেখে পান করেন যেখানে আয়েশা (রাযিঃ) মুখ রেখে পান করেছিলেন, তিনি কখনো তার কোলে টেক লাগতেন এবং কখনো তাঁর মাথা আয়েশা (রাযিঃ) -এর কোলে রেখে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, অথচ কখনো তিনি হায়েয অবস্থায় হতেন, আবার কখনো তাকে হায়েয অবস্থায় ইজার পরিধান করতে আদেশ করতেন, অতঃপর তিনি ইজারের উপর দিয়ে তার শরীরের সাথে শরীর লাগিয়ে শয়ন

করতেন। (৪) তিনি আসরের নামায শেষে তাঁর স্ত্রীদের নিকট গমণ করে তাদের খোজ-খবর নিতেন, অতঃপর রাতে যার পালা তার সাথে রাত্রি যাপন করতেন। (৫) তিনি বিবিগণের মাঝে রাত যাপন এবং খোর-পোষ সমান করে বন্টন করতেন, কখনো তিনি কোন স্ত্রীর প্রতি হাত প্রসারিত করেন অন্য বিবিদের উপস্থিতিতে। (৬) তিনি স্ত্রীদের সাথে রাতের শেষভাগে ও প্রথমভাগে যৌন-মিলন করতেন, আর রাতের প্রথমাংশে স্ত্রী-সহবাস করলে কখনো গোসল করে ঘুমিয়ে যেতেন, আবার কখনো অযু করে ঘুমিয়ে পড়তেন, তাঁকে স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদিতে ত্রিশ ব্যক্তির শক্তি প্রদান করা হয়েছিল। তিনি বলেনঃ সে ব্যক্তি অভিশাপ্ত বা আল্লাহর রহমত থেকে বহিস্কৃত, যে নিজের স্ত্রীর পশ্চাতভাগ দিয়ে যৌনসঙ্গম করে। তিনি আরো বলেনঃ তোমাদের কেউ যদি স্ত্রী-সহবাসের পূর্বে বলেঃ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা জান্নিব-নাশ শায়ত্বান, ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বানা মিম্মা রাযাক্বতানা, -অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখো, আর আমাদেরকে তুমি (এ মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো। তাহলে যদি সে মিলনের মাধ্যমে সন্তান গর্ভধারণ নির্ধারিত থাকে, তবে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারে না।"-সহীহ্ বোখারী, (৭) তিনি বলেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিবাহ করে অথবা দাস ক্রয় করে কিংবা চতুষ্পদ জন্তু ক্রয় করে, তখন উহার ললাট ধরণ করে 'বিসমিল্লাহ্' বলে এবং আল্লাহর নিকট তাতে বরকতের জন্যে দু'আ করে বলেঃ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ
উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা, ওয়া খাইরামা জুবিলাত্ আলাইহি, ওয়া আয়ূযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা জুবিলাত্

আলাইহি।"-সুনানে আবূ দাউদ,-অর্থাৎ, তোমার নিকট উহার কল্যাণের প্রার্থনা জানাই এবং তার সেই কল্যাণময় স্বভাবের যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে এবং তার প্রবৃত্তির অকল্যাণ হতে যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৮) তিনি বিবাহিতদের জন্যে দু'আ করে বলতেনঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

উচ্চারণঃ বারকাল্লাহু লাকা, ওয়া বারক আলাইকা, ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফী খাইরিন।"-সূনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, (৯) তিনি সফর কালে স্ত্রীদের মাঝে লটারী দিতেন, লটারীতে যার নাম উঠতো সে তাঁর সঙ্গে যেতো, অন্যদের জন্য সেই সময়টি গণনা করতেন না। (১০) তাঁর আদর্শ ছিল না গৃহ-বাসভবনের প্রতি অতিশয় মনোযোগ প্রদান করা, উচ্চতা বিশিষ্ট-দীর্ঘ করা, সাজিয়ে-নক্সা করা এবং সম্প্রসারিত করা। (১১) তিনি {সাওদাহ রাযিআল্লাহু আনহা-কে} তালাক প্রদান করেছিলেন, অতঃপর তালাক প্রত্যাহার করে নেন, তিনি নিজের স্ত্রীদের নিকট এক মাস গমণ করবেন না বলে শপথ করে 'ঈলায়ে মুয়াক্কাত' করেন, তবে তিনি কখনই 'যিহার' করেননি। {শরীয়াতের পরিভাষায় 'যিহার' মানে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এ কথা বলা যে, তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায় -হারাম, এটা তালাক অপেক্ষা কঠোরতর।"-অনুবাদক}

(১৫) পানাহার প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ১/১৪২}

(ক) আহার প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ ঃ

(১) যা কিছু খাবার উপস্থিত হতো তা তিনি ফিরিয়ে দিতেন না, আর যা কিছু মুওজুদ নেই তার জন্য তাকাল্লুপ করতেন না, বরং পবিত্র-হালাল বস্তুসমূহ হতে যা কিছু তাঁর সামনে পেশ করা হতো তা থেকে খেয়ে নিতেন। কিন্তু তাঁর রুচিসম্মত না হলে হারাম না বলে তা পরিত্যাগ

করতেন, রুচিসম্মত না হওয়া সত্ত্বেও কোন কিছু নিজের উপর জবরদস্তি করে খেতেন না। তিনি কখনই কোন খাবারে দুষ প্রকাশ করেননি, খাবার তাঁর রুচিসম্মত হলে খেয়েছেন, আর রুচিসম্মত না হলে পরিত্যাগ করেছেন, যেমন তিনি অভ্যস্ত না হওয়ায় 'যাব্ব'-সাণ্ডা নামে এক প্রকার প্রাণী খাননি। (২) যা কিছু মুওজুদ থাকতো তা হতে তিনি আহার করতেন, আর কিছুই না পেলে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন, এমনকি তিনি ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধেন, এক চাঁদ, দু'চাঁদ ও তিন চাঁদ অতিবাহিত হতো, কিন্তু তাঁর ঘরে আগুন প্রজ্বলন করা হতো না। (৩) তাঁর আদর্শ ছিল না যে, নিজেকে একই প্রকার খাবারের উপর অভ্যস্ত করে নেয়া -এমনভাবে যে, উহা ছাড়া অন্য কিছুই খাবেন না। (৪) তিনি মিষ্টি দ্রব্য ও মধু খেয়েছেন এবং তিনি এ দু'টি ভালবাসতেন। তিনি ভেঁড়া, দুম্বা ও মুরগীর গোশ্‌ত এবং হুবারা পাখির গোশ্‌ত, জঙ্গলী গাধার গোশ্‌ত, খরগোশ ও সমুদ্রীয় খাদ্য এবং ভঁনা খাদ্য খেয়েছেন। কাঁচা খেজুর ও শূক্‌না খেজুর খেয়েছেন। তিনি 'সারীদ'-অর্থাৎ, গোশ্‌ত ও রুটি মেশানো এক প্রকার উপাদেয় খাবার খেয়েছেন। তিনি যায়তুনের তৈল দিয়ে রুটি খেয়েছেন। তিনি তাজা খেজুরের সাথে খিরা খেয়েছেন। তিনি রান্নাকৃত কদ্দু খেয়েছেন এবং তিনি সেটি পছন্দ করতেন। তিনি ডেকচিতে অবশিষ্ট শূকনা গোশতের টুকরা খেয়েছেন একং তিনি দুধের সর দিয়ে খেজুর খেয়েছেন। (৫) তিনি গোশ্‌ত পছন্দ করতেন এবং তাঁর নিকট অত্যধিক পছন্দনীয় ছিল বকরীর বাহু ও অগ্রবর্তী অংশ। (৬) তিনি স্বদেশের নবাগত ফল খেতেন এবং উহা হতে আত্মরক্ষা করতেন না। (৭) অধিকাংশ সময় তাঁর খাবার যমীনের উপর দস্তরখানে রাখা হতো। (৮) তিনি ডান-হাতে আহার করার নির্দেশ দিতেন এবং বাম-হাতে খেতে নিষেধ করতেন এবং বলতেনঃ শয়তান বাম-হাতে খায়

এবং বাম-হাতে পান করে।"-সহীহ্ মুসলিম, (৯) তিনি তিন আংগুলে আহার করতেন এবং তিনি আহার শেষে আংগুল চেটে খেতেন।"-সহীহ্ মুসলিম, (১০) তিনি হেলান দিয়ে খাবার খেতেন না।"-সহীহ্ বোখারী, আর হেলান বা ঠেস্ লাগানো তিন প্রকারে হয়ে থাকে ঃ- (১) একপার্শ্বে ঝুঁকে আহার করা, (২) চারজানু হয়ে বসে আহার করা, (৩) এক হাতের উপর ঠেস্ দিয়ে বসে অপর হাতে আহার করা, উক্ত তিন প্রকারই নিন্দিত। তিনি উভয় হাঁটু খাড়া অবস্থায় পাছার উপর বসে আহার করতেন এবং বলেনঃ আমি বসি যেভাবে বসে ক্রীতদাস এবং আমি আহার করে থাকি যেভাবে আহার করে ক্রীতদাস। (১১) যখন তিনি খাবারে হাত রাখতেন তখন بِسْمِ اللَّهِ 'বিসমিল্লাহ্' বলতেন এবং তিনি আহারকারীকে 'বিসমিল্লাহ্' বলার নির্দেশ দিতেন, তিনি আরো বলেনঃ যখন তোমাদের কেউ খাবার খায় তখন শুরুতে যেন 'বিসমিল্লাহ্' বলে, আর যে শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' বলতে ভূলে গেলো সে যেন বলেঃ
بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ 'বিসমিল্লাহি ফী আওয়ালিহী ওয়া আখিরিহী।"-সুনানে তিরমিযী, -অর্থাৎ, শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নামে। (১২) তিনি বলেনঃ যে খাবারে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, শয়তান তাকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়।"-সহীহ্ মুসলিম, (১৩) তিনি খাবার খেতে বসে মেহমানদের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের উপর বারংবার খাবার পেশ করতেন দানশীলদের ন্যায়। (১৪) যখন তাঁর সামনে হতে দস্তরখান উঠানো হতো, তখন তিনি বলতেনঃ

الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

উচ্চারণঃ আল-হামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান ত্বাইয়েবান মুবারাকান ফীহ্, গাইরা মুকফিয়্যী, ওয়ালা-মূয়াদ্দায়ীন, ওয়ালা-মুছতাগনা আনহু রাব্বানা।"-সহীহ্ বোখারী, -অর্থাৎ, পাক-পবিত্র, বরকতময় অনেক অনেক

প্রশংসা আল্লাহর জন্য, হে আমাদের প্রভু! যে খাদ্য হতে নির্লিপ্ত হতে পারবো না, তা কখনই চিরতরে বিদায় দিতে পারবো না এবং তা হতে অমুখাপেক্ষীও হবো না। (১৫) তিনি কারো নিকট পানাহার করলে তাদের জন্যে দু'আ না করা পর্যন্ত বের হতেন না এবং বলতেনঃ

أفطرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طعَامَكُمْ الأبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ المَلائِكَةُ

উচ্চারণঃ আফ্তারা এন্দাকুমুস সায়েমূন, ওয়া-আকালা ত্বাআমাকুমুল আবরার, ওয়া-স্বাল্লাত্ আলাইকুমুল মালাঈকা।"-সুনানে আবূ দাউদ, অর্থাৎ, তোমাদের সাথে ইফতার করলো রোযাদারগণ, তোমাদের আহার গ্রহণ করলো সৎ লোকগণ এবং তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করলো ফেরেশ্তাগণ। (১৬) যদি কেউ মিসকীন-অভাবগ্রস্থ লোকদের মেহ্মানদারী করতো তিনি তার জন্যে দোআ করতেন এবং তার প্রশংসা করতেন। (১৭) তিনি ছোট কিংবা বড়, স্বাধীন কিংবা ক্রীতদাস, বেদুঈন কিংবা বিনদেশী যে কারো সাথে বসে পানাহার করতে ঘৃনা করতেন না। (১৮) রোযারত অবস্থায় তাঁর সামনে খাবার পেশ করা হলে তিনি বলতেনঃ আমি রোযাদার।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, এবং মেহ্মানের প্রতি নির্দেশ জারী করেন যে, যদি সে রোযাদার হয়, তাহলে যেন মেজবানের জন্যে দোআ করে, আর যদি সে রোযাদার না হয় তাহলে যেন আহার করে।"-সহীহ্ মুসলিম, (১৯) কেউ বিশেষভাবে খাবার তৈরী করে তাঁকে দাওয়াত দিলে, তখন তাঁর সাথে অন্য কেউ এসে শামিল হলে, তিনি মেজবানকে তার সম্পর্কে অবহিত করে বলতেনঃ এই ব্যক্তি আমাদের সাথে এসেছে, তোমার ইচ্ছা হলে তাকে অনুমতি দিতে পার, নতুবা তুমি চাইলে সে চলে যাবে।"-সহীহ্ বোখারী, (২০) সাহাবীদের কেউ কেউ তাঁর নিকট অভিযোগ করলো যে, তারা পানাহার করে পরিতৃপ্তি লাভ করে না, তখন তিনি তাদেরকে নির্দেশ

প্রদান করেন যে, তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে না হয়ে একত্রে খাবার খাও এবং আল্লাহর নাম লও তোমাদের খাদ্যে বরকত হবে।"-সুনানে আবূ দাউদ, (২১) তিনি বলেছেনঃ আদম-সন্তান পেটের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করেনি, তার জন্যে কয়েকটি লোক্‌মাই যথেষ্ট ছিল, যদ্বারা স্বীয় পিট সোজা রাখবে, আর অত্যধিক প্রয়োজন হলে এক-তৃতিয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতিয়াংশ পানীয় প্রাণের জন্য এবং এক-তৃতিয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য।"-সুনানে তিরমিযী, (২২) একদা তিনি ঘরে প্রবেশ করে খাবার তালাশ করে কিছুই পেলেন না, তখন তিনি বললেনঃ
اللَّهُمَّ اطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আত্বয়িম মান-আত্বআমানী, ওয়া আস্‌কি মান-সাক্বানী।"-মসনাদে আহ্‌মদ, -অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! যে আমাকে আহার করাবে তুমি তাকে আহার করাও, আর যে আমাকে পান করাবে তুমি তাকে পান করাও।"

(খ) পান করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ ঃ

(১) পান করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ছিল সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, যাতে স্বাস্থ্যের হেফাযত হয়। ঠাণ্ডা-মিষ্টি পানীয় তাঁর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল। তিনি কখনো খালেস দুধ পান করতেন, আবার কখনো পানি-মিশ্রিত দুধ, তিনি দুধ পান করে বলতেনঃ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ - আল্লা-হুম্মা বারিক লানা-ফীহ্, ওয়াযিদনা-মিন্‌হ্,- অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দাও এবং ইহা আরো বেশী করে দাও,- নিঃসন্দেহে এমন কোন বস্তু নেই যা খানা-পিনার জন্য যথেষ্ট হতে পারে একমাত্র দুধ ব্যতীত।"-সুনানে তিরমিযী, (২) তাঁর আদর্শ ছিল না যে, খাবারের উপর পান করা, তাঁর জন্যে রাতের প্রথমভাগে 'নবীয' বানানো হতো এবং তিনি উহা সকালে এবং আগামী রাতে এবং দ্বিতীয়

দিনে ও রাতে এবং তৃতীয় দিন আসর পর্যন্ত পান করতেন, অতঃপর অবশিষ্টগুলি খাদেমকে পান করাতেন অথবা ঢেলে দিতে নির্দেশ দিতেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আরবী শব্দ 'নাবীয' মানে পানিতে পাকা খেজুর ঢেলে রেখে তা মিষ্টি করা, তিন দিন পর নেশাদ্রব্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি উহা পান করতেন না। (৩) তাঁর অভ্যাসগত আদর্শ ছিল বসাবস্থায় পান করা এবং যে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করে তাকে তিনি ধমক দেন, তবে তিনি একদা দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেন, কেউ বলেনঃ তা বিশেষ প্রয়োজনে ছিল, আর কেউ বলেনঃ নিষেধাজ্ঞা রহিত করার জন্য ছিল, আবার কেউ বলেনঃ উভয়টি জায়েয ঘোষণা করার জন্য ছিল। (৪) তিনি পানি পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন এবং বলতেনঃ উহা অধিক তৃপ্তিদায়ক, অধিক হযমকারী এবং অধিক উপকারী।"-সহীহ্ মুসলিম, এখানে তিনি তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন মানে, তিনি পাত্রের বাহিরে নিঃশ্বাস ফেলতেন যেরূপ অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ পান করে তখন যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে, বরং নিঃশ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পাত্র সরিয়ে নিবে।"-সুনানে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, তিনি পাত্রের ফাটল দিয়ে কিংবা মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেন। (৫) তিনি 'বিসমিল্লাহ্'-বলতেন যখন পান করতেন, আর তিনি 'আল-হামদুলিল্লাহ্'-বলতেন যখন পান শেষ করতেন এবং বলেনঃ আল্লাহ্ সেই বান্দার উপর রাযী হন যে খাবার আহার করলে 'আল-হামদুলিল্লাহ্'- বলে এবং পানীয় পান করলে 'আল-হামদুলিল্লাহ্'-বলে।"-সহীহ্ মুসলিম, (৬) তাঁর জন্যে মিষ্টি পানি আনা হতো, ভাল-উত্তম পানি যা লবণাক্ত নয় এবং তা থেকে তিনি গতকালের পুরানোটি গ্রহণ করতেন। (৭) তিনি পান করার পর অবশিষ্ট অংশ ডানে উপস্থিত

ব্যক্তিকে দিতেন যদিও তাঁর বামে কোন প্রবীণ ব্যক্তি থাকে। (৮) তিনি খাবার পাত্র ঢেকে রাখতে নির্দেশ দিতেন, যদিও এক টুকরা কাঠ দিয়ে হয় এবং তিনি 'বিসমিল্লাহ্'-বলে 'মশকের''-পানির পাত্রের মুখ বন্ধ করতেন। আরবী 'ই-কা'-শব্দের অর্থ হলোঃ পাত্রের মুখ বন্ধ করা।"

(১৬) ইসলামের দাওয়াত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালার বিবরণ ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ৩/১১ -৪৪}

(১) তিনি দিনে ও রাত্রে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করতেন, তিনি নবুওয়াতের প্রথমভাগে তিন বছর মক্কায় গোপনীয়ভাবে আল্লাহর প্রতি আহবান করেন, অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

অর্থাৎ, "তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর।"-সূরা হিজর, আঃ ৯৪, এই আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ আরম্ভ করেন এবং আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করেননি, বরং ছোট-বড়. স্বাধীন-ক্রীতদাস, নারী-পুরুষ ও জ্বিন-ইনসান সবাইকে আল্লাহর দিকে আহবান করেন। (২) মক্কায় তাঁর সাহাবীদের উপর নিপীড়ন কঠোরতর হয়ে উঠলে তিনি তাদেরকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। (৩) তিনি তায়েফ গমন করেন এ আশায় যে, তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর সাহায্য করবে, তাই তিনি সেখানে পৌঁছে তাদের দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেন, কিন্তু সাহায্য-সহযোগীতাকারীরূপে কাউকে পেলেন না, বরং তারা তাঁকে সর্বাপেক্ষা কঠিন কষ্ট দিলো এবং তারা তাঁর সাথে এরূপ মন্দ আচরণ করলো যা অন্য কেউ করেনি,

অবশেষে তারা তায়েফ হতে তাঁকে মক্কার দিকে বহিষ্কার করলো, অতঃপর তিনি মোত্‌আম ইবনে আদীর আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। (৪) তিনি মক্কায় দশ বছর পর্যন্ত প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন, তিনি প্রত্যেক বছর হজ্জের মৌসুমে নতুন উদ্যমে ইসলামের দাওয়াত শুরু করতেন এবং হাজীদের তাবুতে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং 'অকায, মেজিন্নাহ্ ও যিল-মজায' প্রবৃতি মেলা মৌসুমে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, এমনকি তিনি আরবের বিভিন্ন গোত্র ও তাদের অবস্থান-স্থল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। (৫) অতঃপর মিনার পাহাড়ী এলাকায় মদীনার 'খাযরাজ' গোত্রের ছয় জন লোকের সাথে দেখা হয়, তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়, অতঃপর তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে লোকদেরকে ইসলামের পথে দাওয়াত দিতে থাকে, ফলে মদীনার ঘরে ঘরে দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে, বস্তুতঃ মদীনায় এমন কোন ঘর বাকী ছিল না যাতে ইসলাম প্রবেশ করেনি। (৬) পরবর্তী বছর হজ্জ মৌসুমে তাদের ১২ জন লোক আসে, তিনি তাদেরকে মিনার আকাবার কাছে সাক্ষ্যাতের ওয়াদা দেন, অতঃপর তারা জামরায়ে আকাবার নিকট একত্রিত হয়ে আল্লাহর রাসূলের নিকট বাইয়াত করেন, বাইয়াতের দফাসমূহ ছিলো ঃ- তারা ভাল-মন্দ সকল অবস্থায় তাঁর কথা শুনবে এবং মানবে, তাঁর জন্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে বারণ করবে, আল্লাহর পথে উঠে দাঁড়াবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না, তারা তাঁর সাহায্য করবে এবং নিজেদের প্রাণ, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারের হেফযতের মতোই তাঁর হেফাযত করবে এবং পুরস্কার স্বরূপ তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। অতঃপর

তারা মদীনায় ফিরে যায়, তখন তিনি তাদের সাথে 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাক্তূম ও মুস্আব ইবনে ওমাইর' (রাযিঃ)-কে কোরআন শিক্ষা ও দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের জন্যে মদীনায় প্রেরণ করেন, ফলে তাদের দাওয়াতে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে, যাদের মধ্যে ছিল 'অছাইদ ইবনে খুযাইর ও সা'দ ইবনে মুআয' (রাযিঃ)। (৭) অতঃপর তিনি মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন, তখন মুসলিমগণ দ্বীন রক্ষার্থে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত শুরু করে, অবশেষে তিনি ও তাঁর সাথী আবূ বকর হিজরত করেন। (৮) তিনি মোহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। তখন এই দলে তাদের সংখ্যা ছিল ৯০ জন পুরুষ।"

(ক) শান্তিচুক্তি-সন্ধি, নিরাপত্তা প্রদান ও দূতদের সাথে ব্যবহার প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ৩/১১২}

(১) সহীহ্ সনদে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সকল মুসলমানের অঙ্গীকার মূলতঃ একই, ফলে তাদের সাধারণ ব্যক্তিরাও তা মেনে চলতে বাধ্য। অর্থাৎ, একজন কোন অঙ্গীকার বা চুক্তি করলে সকলে তা মেনে চলবে।"-সহীহ্ বোখারী, তিনি আরো বলেনঃ যার সাথে কোন জাতির সন্ধি-চুক্তি রয়েছে, সে যেন চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবধি চুক্তি রক্ষা করে চলে, অথবা সন্ধি-চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলে যেন সে ও অপরপক্ষ এতে সমান সমান হয়ে যায়।"-সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, (১) তিনি আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন সন্ধি কিংবা চুক্তিবদ্ধ মানুষকে হত্যা করে সে হত্যাকারীর সাথে আমি সম্পর্কছিন্নকারী।"-সুনানে ইবনে মাজাহ, (৩) যখন 'মুছাইলামাতুল কায্যাব'-এর দু'জন দূত তাঁর নিকট এসে তার ব্যাপারে কথা-বার্তা

বললো, তখন তিনি বলেনঃ যেহেতু দূতদেরকে হত্যা করা হয় না, নচেৎ আমি তোমাদের উভয়ের গর্দান উড়িয়ে দিতাম, তাই তাঁর আদর্শ এভাবে জারী হয় যে, কোন প্রেরিত-দূতকে হত্যা না করা।"-সুনানে আবূ দাউদ, (৪) কোন প্রেরিত-দূত তাঁর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলে, তিনি তাকে বাধা দিয়ে রেখে দিতেন না, বরং তাকে স্বদেশে ফিরিয়ে দিতেন। (৫) সাহাবীদের কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া শত্রুদের সাথে এমন কোন সন্ধি-চুক্তি করলে যাতে মুসলমানদের কোন ক্ষতি নেই, তখন তিনি তা বলবৎ রাখতেন। (৬) তিনি কোরাইশদের সাথে দশ বছর যাবৎ যুদ্ধ বন্ধের উপর শান্তি-চুক্তি করেন এ শর্তে যে, কোরাইশদের কোন লোক মুসলমান হয়ে তাঁর নিকট আসলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কেউ আশ্রয় লাভের জন্যে কোরাইশদের নিকট চলে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না, তবে আল্লাহ্ তাআলা মুহাজির মহিলাদেরকে ফেরত পাঠনোর বিষয়টি রহিত করে দেন এবং তাদেরকে পরীক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করেন, ফলে যে মু'মিনা বলে জানতে পারা যায়, তাকে কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠানো হবে না। {এই প্রসঙ্গে সূরা মুমতাহিনার ১০ -১৩ নং আয়াত নাযিল হয়।"-অনুবাদক} (৭) তিনি মুসলমানদের প্রতি এ মর্মে নির্দেশ জারী করেন, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে মদীনায় এসে যায়, তার কাফের স্বামী মোহরানা আকারে যা কিছু তার পিছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেয়া হবে, আবার মুসলমানের স্ত্রী কাফেরদের নিকট চলে গেলে অনুরূপ মুসলিম স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেয়া কাফেরদের উপর জরুরী, কিন্তু কাফেরগণ যদি তা ফেরত না দেয় এবং মুসলিমগণ এর প্রতিশোধ নিতে চায়, তবে কাফেরদের প্রাপ্য মোহরানা মুসলমানদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক করে আটককৃত মোহারানা থেকে মুসলিম

স্বামীকে তার ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দেয়া হবে। (৮) কোরাইশদের কোন পুরুষ মুসলমান হয়ে তাঁর কাছে চলে আসলে, অতঃপর হোদায়বিয়ার শর্তানুযায়ী তারা তাকে ধরে নিতে আসলে তিনি তাদেরকে বাধা দিতেন না, তবে ফেরত যাওয়া জন্য আগন্তুক ব্যক্তির উপর না জবরদস্তি করতেন, আর না ফেরত যাওয়ার আদেশ দিতেন। যদি কোন নির্যাতীত মুসলিম তাদের কাউকে হত্যা করে কিংবা তাদের মাল লুণ্ঠন করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হতো এবং এসে তাঁর সাথে মিলিত হতো না, তখন তিনি তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেননি এবং কোরাইশদের জন্য তিনি তার জিম্মাদার হননি, {যেমন আবূ বছির (রাযিঃ) ও তার সঙ্গীদের ঘটনা।"-অনুবাদক} (৯) তিনি খায়বরবাসীদের সাথে সন্ধি-চুক্তি করেন যখন তিনি তাদের উপর যুদ্ধে বিজয়ী হন এ শর্তে যে, তারা খায়বর নগরী হতে বহিস্কৃত হবে এবং নিজেদের সাথে সাওয়ারীর উপর যতটা সম্ভব ধন-সম্পদ নিয়ে যাবে, তবে স্বর্ণ-রূপা ও সমরাস্ত্র আল্লাহর রাসূলের জন্য রেখে যাবে। (১০) তিনি খায়বরের কৃষিভূমি এই শর্তে সেখানকার অধিবাসী ইহুদীদেরকে বর্গা-বন্দোবস্ত দেন যে, তারা এতে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করবে, বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক লাভ করবে এবং তিনি যতোদিন চাইবেন তাদেরকে খায়বরে থাকার সুযোগ দেবেন, আবার যখনই তিনি ইচ্ছা করবেন তাদেরকে বহিস্কার করবেন, তাই তিনি প্রত্যেক বছর উৎপন্ন ফসলাদি অনুমাণ করে বন্টন করার জন্য লোক প্রেরণ করতেন, সে অনুমাণ করে মুসলমানদের অংশ নির্ধারণ করে নিতো এবং ইহুদীরা তাদের অংশ নিয়ে নিতো।"

(খ) রাজা-বাদশাহ ও আমীরদেরকে ইসলামের দাওয়াত এবং তাঁদের প্রতি দূত ও চিঠি প্রেরণ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ, ৩/১৪১}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্ ও আমীরদের নামে চিঠি পাঠান এবং তাদের প্রতি দূত প্রেরণ করেন। তিনি রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রতি দাওয়াতী পত্র পাঠান এবং দেহ্ইয়াতুল কালবী (রাযিঃ)-কে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু পরিশেষে ইসলাম গ্রহণ করেনি। (২) তিনি হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর প্রতি চিঠি ও দূত প্রেরণ করেন, ফলে বাদশাহ্ নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। (৩) তিনি আবূ মূসা আশ্‌আরী ও মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ)-কে ইসলামের দাওয়াতের জন্যে 'ইয়ামেন দেশে' প্রেরণ করেন, ফলে তাঁদের দাওয়াতে অধিকাংশ ইয়ামেনবাসী স্বেচ্ছায় যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করে।"

(গ) মুনাফিকদের প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ, ৩/১৪৩}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রকাশ্য অবস্থাকে গ্রহণ করতেন এবং গোপণীয় রহস্যকে আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করতেন, তাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ দিয়ে জেহাদ করতেন, তাদেরকে উপেক্ষা করে চলতেন, তাদের প্রতি কঠোরতা করতেন এবং তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী কথা বলতেন। (২) তিনি তাদের অন্তঃকরণ নিজের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তাদের হত্যা করেননি, ওমর (রাযিঃ) এক মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেনঃ না, লোকেরা যেন একথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ তো নিজের সাথীদেরকে হত্যা করছে।"-সহীহ্ বোখারী,

(১৭) আল্লাহর যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ, ২/৩৩২}

আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ছিল সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ, বরং তাঁর প্রতিটি কথা-বার্তা ছিল আল্লাহর যিকর ও তাঁর পছন্দনীয় বিষয়। উম্মতের প্রতি তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করা ছিল আল্লাহর যিকরে শামিল। তাঁর চুপ থাকা ছিল অন্তরে আল্লাহর যিকর, সুতরাং আল্লাহর যিক্‌র তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে, উঠা-বসা ও শায়িত, চলা-ফেরা, সফর-ইকামা সকল অবস্থয়ই জারী ছিল।"

(ক) সকাল-সন্ধায় আল্লাহর যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ ঃ ২/৩৩২}

(১) তিনি সকালে বলতেনঃ

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلام وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلاص وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ

উচ্চারণঃ আস্ববাহ্না আলা-ফিৎরাতিল ইসলাম, ওয়া-আলা কালিমাতিল ইখলাস্ব, ওয়া-আলা দ্বীনে নবীয়্যিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া-আলা মিল্লাতে আবী-না ইবরাহীমা হানীফান মুসলিমান, ওয়া-মা-কানা মিনাল মুশরিকীন।"-অর্থাৎ, আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর ও ইখলাসের বাণীর উপর এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের উপর, আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর মিল্লাতের উপর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।"-মাসনদে আহমদ, তিনি ইরশাদ করেনঃ যখন তোমাদের কেউ প্রত্যুষে উপনীত হবে, তখন সে বলবে ঃ

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ

وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

উচ্চারণঃ আস্‌বাহ্‌না ওয়া-আস্‌বাহাল মুল্‌কু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আল্লা-হুম্মা ইন্নি আস্‌আলুকা খাইরা হাযাল-য়াউম, ফাতহাহু ওয়া নাস্বরাহু, ওয়া নূরাহু ওয়া বারকাতাহু ওয়া হুদাহু, ওয়া-আউযুবিকা মিন শাররি মা-ফীহ্‌, ওয়া-শাররি মা-বাঅদাহু। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে আমরা এবং সকল সৃষ্টি জগত প্রভাতে উপনীত হয়েছি, হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট কামনা করি এই দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, নূর ও বরকত এবং হেদায়াত, আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এই দিনের এবং এই দিনের পরের অকল্যাণ হতে। অতঃপর যখন সন্ধা হবে অনুরূপ বলবে। ”-সুনানে আবূ দাউদ, (২) তিনি বলেনঃ সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্তেগফার হলো বান্দা বলবে ঃ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্‌তা রাব্বী, লা-ইলাহা ইল্লা-আন্‌তা, খালাক্বতানী ওয়া-আনা আব্দুকা, ওয়া-আনা আলা-আহ্‌দিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্তাতা'তু আউযুবিকা মিন্‌-শাররিমা সানা'তু, আবূ-লাকা বি-নি'উমাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া-আবূ লাকা বিজাম্‌বী, ফাগ্‌ফির্‌লী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুজযুনূবা ইল্লা আন্‌তা ; -অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌! তুমিই আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দা, আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকবো, আমার কৃতকর্মের কু-ফল ও মন্দ পরিণাম হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, তুমি আমাকে যেসব নেয়ামত দান করেছো আমি তা স্বীকার করছি এবং স্বীকার করছি আমার গুনাহের কথা, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে কেউ উক্ত দু'আটি

দিনের বেলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলে এবং সন্ধা হওয়ার আগেই মারা যায়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি উহা রাত্রিবেলায় আন্তরিকতার সাথে বলে এবং সকাল হওয়ার আগেই মারা যায়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। "-সহীহ্ বোখারী, (৩) তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দৈনিক এ দু'আটি এক শত বার পাঠ করবে ঃ

لا إلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু, লা-শারীকালাহু, লাহুল মুল্কু, ওয়ালাহুল হাম্দু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইয়্যিন ক্বাদীর।"-অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ বা সত্য মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই জন্যে এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে, তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ; তাহলে সে দশ জন দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ পুণ্য লাভ করবে, তার জন্য একশত নে'কী লেখা হবে ও একশত গুণাহ্ মাফ করা হবে, সে উক্ত দিবসে সন্ধা পর্যন্ত শয়তানের (প্ররোচনা ও বিভ্রান্তি) হতে সুরক্ষিত থাকবে, আর কিয়ামতের দিন তার থেকে উত্তম আমল নিয়ে কেহ আসবে না, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে তার চেয়েও অধিক পরিমাণে আমল করেছে।"-বোখারী, মুসলিম, (৪) তিনি সকাল-সন্ধায় এ দু'আ করতেনঃ

اللَّهُمَّ إنِّي أسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إنِّي أسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

-অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজনের এবং আমার ধন-সম্পদের নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ্! তুমি আমার দোষ-

ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখো এবং আমার চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দাও, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখো আমার সম্মুখের বিপদ হতে এবং পশ্চাদের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং আমার বামের বিপদ হতে, আর উর্ধদেশের গযব হতে, তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদ হতে, তথা মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে।"-সুনানে আবূ দাউদ, (৫) তিনি আরো বলেছেনঃ যে কেউ এ দু'আটি দৈনিক সকাল-সন্ধায় তিন-তিন বার করে পাঠ করেঃ

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الارْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহিল-লাযী, লা-ইয়াদুররু, মা'আ ইছমিহী সাইয়্যুন, ফিল আরদি ওয়ালা ফিস্-সামায়ি, ওয়া হুয়াস্ সামীউল আলীম। অর্থাৎ, আমি সেই আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারে না, বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা ; তাহলে কোন বস্তুই তার কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না।"-সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, (৬) আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাযিঃ) তাঁকে বলেনঃ আপনি আমাকে শিক্ষা দিন, সকাল-সন্ধায় আমি কোন দু'আটি পাঠ করবো, তখন জবাবে তিনি বলেন তুমি বলবে ঃ

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ফাতিরিস-সামাওয়াতি ওয়াল আরযি, আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ-শাহাদাতি, লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা, রাব্বা কুল্লি-শাইয়্যিন ওয়া মালিকাহু, আউযুবিকা মিন্-শাররি নাফ্সী, ওয়া-মিন শাররিশ-শায়তানে ওয়া শিরকিহ্, ওয়া আন-আক্বতারিফা আলা-নাফ্সী সূআন, আউ আজুররুহ্ ইলা-মুসলিম। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা,

তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান, তুমি সকল বস্তুর প্রভু-প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আর আমি নিজের অনিষ্ট করা হতে এবং কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি আরো বলেনঃ হে আবূ বকর! তুমি সকাল-সন্ধায় এবং তোমার শয়নকালে তা পাঠ করবে।"-সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে তিরমিযী।

(খ) ঘর থেকে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহর যিক্র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ২/৩৩৫}

(১) তিনি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ ـ اَللّٰهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ্, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন আদিল্লা আউ উদাল্লা, আযিল্লা আউ উযাল্লা, আযলিমা আউ উযলামা, আজহালা আউজহালা আলাই। অর্থাৎ, আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম, অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎকাজ করার কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ;- হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে অথবা অন্যের দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হতে, আমি অন্যকে পদংখলন করতে অথবা অন্যের দ্বারা পদংখলিত হতে, আমি অন্যকে নির্যাতন করতে অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হতে এবং আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে অথবা নিজে অপরের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে।"-সুনানে তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, (২) তিনি আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বললোঃ- -

بِسْمِ اللَّـهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّـهِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللَّـهِ উচ্চারণঃ 'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলা-ল্লাহ্, ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা-বিল্লাহ্'- তখন তাকে সম্ভোধন করে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট, তুমি সুরক্ষিত হয়েছ এবং তুমি সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছ, আর শয়তান তোমার থেকে বহু দূরে সরে গেছে।"-সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে তিরমিযী,

(৩) তিনি প্রত্যুষে মসজিদে গমনকালে বলতেনঃ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًااللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِي نُورًا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাজ-আল ফী-ক্বালবী নূরান, ওয়া ফী-বাসারী নূরান, ওয়া ফী-সাম্‌য়ী নূরান, ওয়া আন্‌-য়ামীনী নূরান, ওয়া আন্‌-য়াসারী নূরান, ওয়া ফাওক্বী নূরান, ওয়া তাহ্‌তী নূরান, ওয়া আমা-মী নূরান, ওয়া খাল্‌ফী নূরান, আল্লা-হুম্মা আয়যিম লী নূরান। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমার অন্তরে এবং জবানে 'নূর'-জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণ শক্তিতে এবং আমার দর্শন শক্তিতে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার উপরে, আমার নিচে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পিছনে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, হে আল্লাহ্! তুমি জ্যোতিকে আমার জন্য অনেক বড় করে দাও।"-সহীহ্ মুসলিম, (৪) তিনি আরো বলেনঃ যখন কোন ব্যক্তি স্বগৃহে প্রবেশ করে তখন সে বলবে ঃ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাল মাওলিজি ওয়া খাইরাল মাখরাজি, বিস্‌মিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা, ওয়া আলাল্লাহি রাব্বুনা তাওয়াক্কাল-না। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট উত্তম প্রত্যাগমন ও উত্তম বহির্গমন প্রার্থনা করছি, আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই বের হই এবং আমাদের প্রভূ আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করি। অতঃপর নিজ পরিবারবর্গের উপর সালাম

বলবে।"-সুনানে আবূ দাউদ,

(গ) মসজিদে প্রবেশ ও মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় আল্লাহর যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ২/৩৩৬}

(১) তিনি মসজিদে প্রবেশকালে বলতেনঃ

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণঃ আউযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া বিসুলতানিহিল কাদীম, মিনাশ শায়তানির রাজীম ;-অর্থাৎ, আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর করুণাময় সত্বা ও সার্বভৌম শক্তির নামে।"-সুনানে আবূ দাউদ, (২) তিনি বলেনঃ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, নবীজীর উপর সালাত-সালাম পাঠ করে বলবেঃ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাফ্ তাহ্-লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিক ; -অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও ;- আর যখন মসজিদ হতে বের হবে তখন বলবেঃ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাযলিকা। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।"- আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্,

(ঘ) নতুন চাঁদ দেখাকালে আল্লাহর যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ২/৩৬১}

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে বলতেনঃ

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল-আমনি ওয়াল ঈমান, ওয়াস-সালা-মাতি ওয়াল ইসলাম, রাব্বী ওয়া রাব্বুকা-ল্লাহ্। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা ও ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে উদিত কর, আল্লাহ্ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের)

প্রভূ-প্রতিপালক।”-সুনানে তিরমিযী, মাসনদে আহ্মদ,

(ঙ) হাঁচি ও হাই তোলাকালে আল্লাহর যিক্র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ২/৩৭১ -৩৯৭}

(১) সহীহ্ সনদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন, অতএব যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে الحَمْدُ لِلَّهِ 'আল-হাম্‌দুলিল্লাহ্' বলে, তখন যে মুসলমানই তা শুনে তার উপর يَرْحَمُكَ اللهُ 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'-বলা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, আর হাই উঠার ব্যাপারটি হয়ে থাকে শয়তানের পক্ষ হতে, কাজেই তোমাদের কারো হাই উঠার উপক্রম হলে সে যেন তা সাধ্যমত চেপে রাখার চেষ্টা করে, কারণ কেউ হাই তুললে তাতে শয়তান হাসে।”-সহীহ্ বোখারী, (২) তিনি যখন হাঁচি দিতেন তখন মুখের উপর নিজের হাত বা কাপড় রাখতেন এবং হাঁচির আওয়াজ নিচু বা নিম্নগামী করতেন।”-সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, (৩) তিনি যখন হাঁচি দিতেন তখন কেউ يَرْحَمُكَ اللهُ 'ইয়ারহামু - কাল্লাহ্'-বললে তিনি জবাবে বলতেনঃ يَرْحَمُنَا اللّه واياكم يَغْفِرُ اللّهُ لَنا وَلَكُمْ “ইয়ারহামুনা-ল্লাহু ওয়া ইয়্যাকুম, ওয়া ইয়াগ্‌ফিরু লানা ওয়া লাকুম' (৪) তিনি আরো বলেনঃ তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে বলবেঃ الحَمْدُ لِلَّهِ 'আল-হাম্‌দুলিল্লাহ্'-সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তখন তার ভাই অথবা সাথী বলবেঃ يَرْحَمُكَ اللهُ 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'-আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন, তার জন্য সাথী-'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'-বললে সে যেন জবাবে বলেঃ يَهْدِيكُمُ اللّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ - 'ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহ্ ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম'- আল্লাহ্ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল করুন।”-সহীহ্ বোখারী, (৫) তিনি আরো বলেনঃ তোমাদের কেউ হাঁচি

দিয়ে الْحَمْدُ لِلَّهِ 'আল-হাম্দুলিল্লাহ্' বললে, তার জবাবে তোমরা يَرْحَمُكَ اللهُ 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'-বলবে, আর যদি সে হাঁচি দিয়ে الْحَمْدُ لِلَّهِ 'আল-হাম্দুলিল্লাহ্' না বলে, তাহলে তোমরাও يَرْحَمُكَ اللهُ 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'-বলবে না।"-সহীহ্ মুসলিম, আর যদি কেউ তিনবারের অধিক হাঁচি দিতো, তাহলে তিনি চতুর্থ বারে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'-বলতেন না, বরং বলতেনঃ এই ব্যক্তি সর্দ্দি রোগে আক্রান্ত। (৬) সহীহ্ সনদে প্রমাণিত যে, ইহুদীগণ তাঁর উপস্থিতিতে হাঁচি দিতো এবং আশা করতো যে, তিনি জবাবে তাদেরকে يَرْحَمُكُمُ اللهُ -'ইয়ারহামু -কুমুল্লাহ্'-আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন,- বলবেন, কিন্তু তিনি জবাবে বলতেনঃ - يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ - অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল করুন।"

(চ) কোন বিপদগ্রস্থ লোক দেখে পঠিত দোআ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ২/৪১৭}

তিনি ইরশাদ করেনঃ যে কেউ কোন বিপদগ্রস্থ লোক দেখে বলেঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلا

উচ্চারণঃ আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযী আ-ফা-নী মিন্মাব-তালাকা বিহী, ওয়া ফায্যালানী আলা কাসীরিন মিন্মান খালাকা তাফযীলা ;- অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে নিরাপদে রেখেছেন সেই বিপদ থেকে যা দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টি -জগতের অনেকের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন ;- তাহলে সে উক্ত বিপদে আক্রান্ত হবে না, তা যে ধরণেরই হোক।"-সুনানে তিরমিযী,

(ছ) মোরগ ও গাধার ডাক শুনাকালে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ ঃ ২/৪২৬}

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দেন,

যখন তারা গাধার ডাক শুনে তখন যেন শয়তান হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে, আর যখন মোরগের ডাক শুনে তখন যেন আল্লাহ্র অনুগ্রহ কামনা করে।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম,
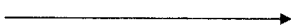
(জ) রাগান্বিত ব্যক্তির কথিত ও কৃত বিষয়াবলী প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ২/৪২৩}

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যধিক রাগান্বিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, সে যেন অযু করে এবং বসে পড়ে যদি সে দাঁড়ানো থাকে, আর শোয়ে পড়ে যদি সে বসা থাকে এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে।"

(১৮) আযান ও আযানের সময় আল্লাহ্র যিক্র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ২/৩৫৫}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারজীয়ে'র সাথে আযান এবং তারজীয়' ছাড়া আযান উভয়টি সুন্নাত করেন। (আযানে তারজীয়' শব্দের মর্মার্থ হলোঃ মুয়াযযিন কর্তৃক 'শাহাদত বাণীদ্বয়' উচ্চঃস্বরে বলার পর দ্বিতীয় বার নিম্নস্বরে পাঠ করা।"-অনুবাদক) আর ইকামতের শব্দগুলো দু'বার দু'বার ও একবার একবার করে উচ্চারণ করার বিধান করেন, কিন্তু 'ক্বাদ-ক্বামাতিস্ সালাহ্'-বাক্যটি কখনই একবার বলেননি। (২) তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য বিধান করেন যে, আযান শ্রবণকারী ঠিক সেই বাক্যগুলির পুনারাবৃত্তি করবে যেগুলি মুয়াযযিন বলে থাকে, কিন্তু 'হাইয়্যা আলাস্-সালাহ' ও হাইয়্যা আলাল-ফালাহ্'-বাক্যদ্বয়ের পরিবর্তে 'লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা-বিল্লাহ্'- বলা তাঁর থেকে সহীহ্ সনদে প্রমাণিত আছে। (৩) তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে এ দু'আটি পাঠ করে ঃ →

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا وَبِالإِسْلامِ دِينًا

উচ্চারণঃ আশহাদু আললা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু, ওয়া-আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ্, রাযীদু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান, ওয়া বিল-ইসলামে দ্বীনান ;-অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাসূল, আর আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদকে রাসূল এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট ;- তাহলে তার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"-সহীহ্ মুসলিম, (৪) তিনি আযান শ্রবণকারীর জন্যে বিধান করেন যে, সে মুয়াযযিনের আযানের জবাবের পর নবীজীর উপর সালাত-সালাম পাঠ করে এ দু'আটি পড়বে ঃ

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতি, ওয়াস সালাতিল-ক্বায়েমাতি, আতি-মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা, ওয়াল-ফাযীলাতা, ওয়াবআসহু মাকামাম মাহ্মূদানিল্লাযী ওয়াআদ্তাহ',- অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভূ, তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উসীলা এবং ফযীলত তথা উচ্চতম মর্যাদা দান করো এবং তাঁকে তোমার ওয়াদাকৃত প্রশংসিত স্থানে পৌছিয়ে দাও।"-সহীহ্ বোখারী, (৫) তিনি আরো বলেছেনঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না।"- সুনানে আবূ দাউদ,

(১৯) যিল-হাজ্জ মাসে আল্লাহর যিক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ, ২/৩৬০}

(১) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে বেশী বেশী দু'আ করতেন এবং তাতে অধিকহারে 'তাকবীর, তাহ্‌লীল, ও তাহ্‌মীদ তথা 'সুবহানাল্লাহ্‌, ওয়াল হামদুলিল্লাহ্‌, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবর' পাঠ করার নির্দেশ দেন।"

(২০) কোরআনুল কারীম তিলাওয়াত প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ, ২/৩৬৩}

(১) কোরআনের অংশবিশেষ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল যা তিনি নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন এবং তাতে তিনি কখনই অলসতা করতেন না।
(২) তাঁর তিলাওয়াত ছিল ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, তীব্রতা ও তাড়াহুড়ার সাথে নয়, বরং প্রতিটি অক্ষর সুস্পষ্ট করে উচ্চরণ করতেন।
(৩) তাঁর তিলাওয়াত ছিল বিভক্ত ও সাইজ করা। তিনি প্রত্যেকটি আয়াত শেষে থেমে যেতেন। তিনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে সূরা আবৃত্তি করতেন, এমনকি বড় সূরা আরো অত্যধিক বড় হয়ে যেতো।
(৪) তিনি মদ্দের হরফকে টেনে দীর্ঘায়িত করে পড়তেন, অতএব 'আর-রাহ্‌মা-ন' ও 'আর-রাহী-ম'-শব্দদ্বয় টেনে দীর্ঘায়িত করে পাঠ করতেন।
(৫) তিনি তিলাওয়াতের শুরুতে আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেনঃ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ উচ্চারণঃ আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌ শায়ত্বানির রাজীম;- অর্থাৎ, আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ; আবার কখনো বলতেন ঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ من هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আউযু বিকা মিনাশ্‌ শায়ত্বানির রাজীম, ওয়া হাম্‌যিহী, ওয়া নফ্‌খিহী, ওয়া নফ্‌সিহী।"-সুনানে আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ,

-অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান এবং তার কুমন্ত্রনা, ফুৎকার ও ওয়াসওয়াসা হতে। (৬) তিনি দাঁড়ানো, বসা, শোয়া এবং অযু অবস্থায় ও অযু ছাড়া সর্বাবস্থায় কোরআন তিলাওয়াত করতেন, একমাত্র গোসল ফরয হওয়া ছাড়া অন্য কিছু তাঁকে কোরআন তিলাওয়াত হতে বিরত রাখতো না। (৭) তিনি সুললিত কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করতেন এবং বলেনঃ যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কোরআন পাঠ করে না সে আমাদের দলভূক্ত নয়।"-সহীহ্ বোখারী, তিনি আরো বলেনঃ "সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে কোরআনের সুন্দর্য্য বৃদ্ধি করো।"-সুনানে আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, (৮) তিনি কখনো অন্যের মুখ থেকে কোরআন তিলাওয়াত শুনতে ভালবাসতেন।"-সহীহ্ বোখারী, (৯) তিনি সিজদার আয়াত পাঠের পর 'আল্লাহু আকবর'- বলে সিজদা করতেন এবং কখনো সিজদায় বলতেনঃ

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

উচ্চারণঃ সাজাদা অজহী লিল্লাযী খালাকাহু, ওয়া-শাক্কা সামআহু ওয়া বাস্বারাহু বি-হাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী ;-অর্থাৎ, আমার মুখমণ্ডল (সহ আমার সমগ্র দেহ) সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্বার জন্য যিনি উহাকে সৃষ্টি করেছেন এবং উহার কর্ণ ও উহার চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিতে।"-সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, আবার কখনো বলতেনঃ

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! উহার দ্বারা তোমার নিকট আমার জন্য নেকী লিখে রাখো এবং উহার দ্বারা আমার পাপরাশী দূর করে দাও, এবং উহাকে আমার জন্য গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে জমা করে রাখো, আর উহাকে আমার নিকট হতে কবূল করো যেমন কবূল করেছো তোমার বান্দা

দাউদ (আঃ) হতে।"-সুনানে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, আর সিজদায়ে তিলাওয়াত হতে মাথা উত্তোলনকালে তাকবীর বলা তাঁর থেকে প্রমাণিত নেই, আর না তিনি তাশাহহুদ পাঠ করেন, আর না সালাম ফিরান।"

(২১) খোৎবা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ১/১৭৯}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোৎবা দেওয়ার সময় তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেতো, স্বর উচ্চ হতো এবং তাঁর রাগভাব খুব বেড়ে যেতো, মনে হয় যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সকাল-সন্ধ্যায় হামলার ভয় প্রদর্শনকারী, তিনি বলতেনঃ আমি ও কিয়ামত দিবস প্রেরিত হয়েছি এরূপ, তখন তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যম আঙ্গুলি একত্রিত করতেন, তিনি আরো বলতেনঃ

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَة

অর্থাৎ, অতঃপর, নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী আল্লাহর কিবাত এবং সর্বোত্তম জীবনাদর্শ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'-এর জীবনাদর্শ, আর নিকৃষ্টতম বিষয় হলো দ্বীনে নবাবিষ্কৃত বিদআত এবং সকল বিদআতই পথভ্রষ্টতা।"-সহীহ্ মুসলিম, (২) তিনি যখনই খোৎবা প্রদান করতেন তখনই আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন, তিনি সাহাবীদেরকে 'খোৎবাতুল হাজাহ্'-তথা এই খোৎবাটি শিক্ষা দিতেন ঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا

অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং

তাঁরই নিকট সাহায্য কামনা করি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং সকল বিপর্যয় ও কুকীর্তি হতে আত্মরক্ষার জন্য আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দান করেন তার কোন পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর তিনি এ তিনটি আয়াত পাঠ করতেনঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভাবে ভয় করো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মরো না।"-সূরা আলে ইমরান,আঃ ১০২, "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন।"-সূরা নিসা,আঃ ১, " হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।"-সূরা আহযাব,আঃ ৭০-৭১, (৩) তিনি সাহাবীদেরকে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইস্তিখারা করার নিয়ম শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে তিনি তাদেরকে কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন এবং বলতেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরয সালাত ছাড়া দু'রাকাত নফল নামায পড়ে, তারপর এ দু'আটি পড়ে ঃ-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা, ওয়া আস্তাক্ব - দিরুকা বিকুদ্রাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফায্লিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা-আক্বদির, ওয়া-তা'লামু ওয়ালা-আ'লাম,

ওয়া-আন্তা আল্লামুল গুয়ূব, আল্লা-হুম্মা ইন-কুন্তা তা'লাম আন্না হা-যাল আম্‌রা, {'হা-যাল আম্‌রা'- বলার সময় নিজের প্রয়োজনের কথা মনে করবে} খায়রুন-লী ফী-দ্বীনী ওয়া-মা'আশী ওয়া-আ-কিবাতি আমরী, ফী-আ-জিলি আমরী, ওয়া-আজিলিহী, ফাক্বদিরহু-লী, ওয়া-ইয়াসসিরহু -লী, সুম্মা বা-রিক্‌লী-ফীহ্‌, ওয়া-ইন-কুন্তা তা'লাম আন্না-হা-যাল আম্‌রা, {এখানেও পুনরায় নিজের প্রয়োজনের কথা মনে করবে} শাররুল-লী ফী-দ্বীনী ওয়া-মা'আশী ওয়া-আ-কিবাতি আমরী, ফী-আ-জিলি আমরী, ওয়া-আজিলিহী, ফাস্‌রিফহু আন্নী, ওয়াসরিফনী আনহু, ওয়াকদির লিয়াল খায়রা হায়সু কা-ন, সুম্মারযিনী বিহ্‌।"-সহীহ্‌ বোখারী, অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে এ বিষয়ে ইস্তিখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) করছি এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার নিকট এ বিষয়ে কল্যাণ লাভের সামর্থ প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তোমারই মহান অনুগ্রহ ও কল্যাণের ভাণ্ডার থেকে প্রার্থনা করছি, কারণ তুমি তো সব কিছু করার ক্ষমতা রাখো আর আমার তো কোন ক্ষমতা নেই এবং তুমি তো সবই জান, আর আমি কিছুই জানি না, আর তুমিই তো অদৃশ্যের একমাত্র মহাজ্ঞানী, - হে আল্লাহ্‌! তুমি যদি জান যে, আমার মনস্ত করা এই বিষয়টি আমার জন্য কল্যাণকর হবে আমার দ্বীনী ও দুনয়াবী জীবনে এবং শেষ পরিণামে, কিংবা আমার জলদি কাজে অথবা বিলম্বিত কাজে, তাহলে সে কাজটি আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও, আর তাতে আমার জন্য বরকত দান করো, পক্ষান্তরে তুমি যদি জান যে, আমার মনস্ত করা এই বিষয়টি আমার জন্য ক্ষতিকর হবে আমার দ্বীনী ও দুনয়াবী জীবনে এবং শেষ পরিণামে, কিংবা আমার জলদি কাজে অথবা বিলম্বিত কাজে, তাহলে তাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা

থেকে ফিরিয়ে রাখো, আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করো তা যেখানেই রয়েছে এবং তার উপর আমাকে সন্তুষ্ট রাখো।”

(২২) ঘুমানো, জাগ্রত হওয়া ও স্বপ্ন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ, ১/১৪৯}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো বিছানার উপর ঘুমাতেন, আর কখনো চর্মনির্মিত বিছানার উপর, কখনো চাটাইয়ের উপর। আবার কখনো যমীনের উপর, আর কখনো চৌকীর উপর, তাঁর বিছনা ছিল চামড়ার, যার ভিতরকার উপকরণ ছিল খেজুর বৃক্ষের ছাল, আর অনুরূপ ছিল তাঁর বালিশ। (২) তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুমাতেন না এবং প্রয়োজনীয় ঘুম থেকে নিজেকে বঞ্চিতও করতেন না। (৩) তিনি রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন এবং শেষাংশে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর এবাদত করতেন, আবার কখনো মুসলমানদের সার্থ্য রক্ষার্থে রাতের প্রথমাংশেও জাগ্রত থাকেন। (৪) তিনি সফরকালে যখন শেষ-রাতে বিশ্রাম করতেন তখন তিনি তাঁর ডান কাতে শুতেন, আর যখন তিনি ফজরের কিছুক্ষণ আগে বিশ্রাম করতেন তখন বাহু খাড়া করে হাতের পাঞ্জার উপর মাথা রাখতেন। (৫) তিনি ঘুমালে সাহাবীদের কেউ তাঁকে জাগ্রত করতো না যতক্ষণ না তিনি নিজেই জাগ্রত হতেন, বস্তুতঃ তাঁর চক্ষুদ্বয় ঘুমালেও তাঁর অন্তর ঘুমাতো না। (৬) তিনি যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে তাঁর শয্যায় গমন করতেন, তখন বলতেন ঃ-

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا উচ্চরণঃ বিইসমিকা আল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া-আহ্য়া ;- অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তোমারই নামে আমার মৃত্যুবরণ ও আমার জীবনধরণ।”-সহীহ্ বোখারী, এবং তিনি স্বীয় দু'হাতের তালু মিলাতেন, অতঃপর সূরা ইখলাস ‘কুল হুআল্লাহু আহাদ’ এবং ‘মুআউয়েযাতাইন’-

তথা 'কুল আউযু বি রাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আউযু বি রাব্বিন নাস' পাঠ করে তাতে ফুঁক দিতেন, তারপর দু'হাতের তালু দ্বারা দেহের যতটা অংশ সম্ভব মাসেহ করতেন। মাসেহ আরম্ভ করতেন তাঁর মস্তক ও মুখমণ্ডল এবং দেহের সামনের দিক থেকে, আর তিনি এরূপ তিনবার করতেন।"-সহীহ্ বোখারী, (৭) তিনি ডান কাতে ঘুমাতেন এবং গালের নিচে হাত রেখে বলতেন ঃ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাব্‌আসু এবা-দাক ;- হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার আযাব হতে রক্ষা করো যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থান ঘঠাবে।"-সুনানে আবূ দাউদ, তিনি কোন সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেনঃ যখন তুমি শয্যায় গমন করবে তখন নামাযের অযুর ন্যায় অযু করবে, অতঃপর তোমার ডান কাতে শুয়ে বলবে ঃ

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَا وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি আমার নফ্‌সকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম, আমার সমগ্র কার্য-ক্রম তোমার উপর সোপর্দ করলাম, আমার সত্বাকে তোমার দিকে ফেরালাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার আশ্রয়ে ঠেকালাম তোমার নিকট তোমার রহমতের আশা-ভরসা এবং তোমার শাস্তির ভয়-ভীতি সহকারে, তুমি ছাড়া কোথাও আশ্রয়স্থল ও মুক্তির উপায় নেই, আমি ঈমান আনলাম তোমার কিতাবের উপর, যা তুমি নাযিল করেছো এবং তোমার নবীর উপর, যাকে তুমি প্রেরণ করেছো। যদি তুমি সেই রাত মৃত্যু বরণ কর, তাহলে তুমি ইসলামের উপরই মৃত্যু বরণ করবে"-সহীহ্ বোখারী, (৮) তিনি রাত্রে জাগ্রত হয়ে বলতেন ঃ

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল (আঃ) -এর রব, আকাশমণ্ডলী-পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য-অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী, তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে ফায়সালা দিয়ে যেসব বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল, অতএব বিরোধপূর্ণ বিষয়াবলীতে তুমি আমাকে স্বীয় অনুগ্রহে সত্যের প্রতি পথ প্রদর্শন করো, কেননা তুমি যাকে চাও সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকো।"-সহীহ্ মুসলিম, (৯) তিনি বিছানায় জাগ্রত হয়ে বলতেনঃ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ উচ্চারণঃ আল্ হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দামাামাতানা, ওয়া ইলাইহিন নুশূর। অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবন দান করেছেন, এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে ; আর তখন তিনি মিসওয়াক করতেন এবং অনেক সময় সূরা আলে ইমরানের আখেরী দশটি আয়াত পাঠ করতেন।"-সহীহ্ বোখারী, (১০) তিনি ভোরে মোরগের ডাক শুনে জাগ্রত হতেন, তখন তিনি 'সুব্হানাল্লাহ্, ওয়াল-হাম্দুলিল্লাহ্, ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবর' বলতেন এবং আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন। (১১) তিনি বলেনঃ সৎ-ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং খারাপ স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে, অতএব কোন ব্যক্তি অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন তার বাঁ দিকে তিনবার থু-থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং কারো নিকট তা বর্ণনা করবে না, পক্ষান্তরে যদি সে ভালো স্বপ্ন দেখে থাকে, তাহলে তার উচিত সুসংবাদ গ্রহণ করা এবং তা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া কারো নিকট বিবৃত না করা।"-সহীহ্ বোখারী, তিনি আরো বলেনঃ তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যে কাতে শুয়েছিল তা যেন পরিবর্তন করে নেয় এবং উঠে নামায পড়ে।"-সহীহ্ মুসলিম,

(২৩) ফিৎরাত বা স্বভাবজাত-কর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্যের উপকরণ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ, ১/১৬৭}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক খোশবু ব্যবহার করতেন এবং খোশবু-সুবাস পছন্দ করতেন, এবং তিনি কখনো খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না।"-সহীহ্ বোখারী, তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় ছিল মেশ্ক আম্বরের সুগন্ধি। (২) তিনি মিসওয়াক করা পছন্দ করতেন, তিন রোযারত অবস্থায় এবং রোযা ছাড়া অবস্থায় মিসওয়াক করতেন, অনুরূপ নিদ্রা হতে জাগ্রতকালে, অযু করার সময়, নামাযের সময় এবং ঘরে প্রবেশকালে মিসওয়াক করতেন। (৩) তিনি সুরমা লাগাতেন এবং বলতেনঃ তোমাদের সর্বোত্তম সুরমা হলো 'ইস্‌মদ'-তথা কালো সুরমা, যা চক্ষু পরিস্কার করে এবং চুল উৎপন্ন করে।"-সুনানে আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, (৪) তিনি কখনো নিজেই মাথায় ও দাড়িতে চিরুনী করতেন, আবার কখনো উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাযিঃ) তাঁর মাথা ও দাড়িতে চিরুনী করে দিতেন, আর মাথা মুণ্ডণো প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শ ছিল, সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডণ করা, অথবা সম্পূর্ণ চুল রেখে দেয়া। (৫) হজ্জ-ওমরা ছাড়া অন্য সময় মাথা মুণ্ডণো তাঁর থেকে সহীহ্ সনদে প্রমাণিত নেই, আর তাঁর চুল ছিল কাঁধের উপর প্রচুর, জুম্মার উপরে এবং ওফরার চেয়ে কম, যা তাঁর কানদ্বয়ের লতির সাথে লেগেছিল। (৬) তিনি 'ক্বযাঅ'-তথা মাথার চুলের কিছু অংশ মুণ্ডণ করে কিছু অংশে চুল রেখে দিতে নিষেধ করেন। (৭) তিনি আরো বলেনঃ তোমরা কাফের-মুশরিকদের বিরোধিতা করো, দাড়ি প্রাচুর্য করো এবং গোঁফ কেটে ফেলো।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, (৮) পোষাক-পরিচ্ছদ হতে যা কিছু সহজ-সাধ্য হতো,

তাই তিনি পরিধান করতেন, কখনো পশমের তৈরী, আবার কখনো তুলা-সুতার তৈরী, আর কখনো উলের তৈরী পোষাক। আর তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় পোষাক ছিল 'ক্বামীস'-তথা জামা।"-সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, (৯) তিনি ডোরাদার ইয়ামানী চাদর ও ডোরাদার সবুজ চাদর পরিধান করেন, তিনি জুব্বা, পায়জামা, লুঙ্গি, চাদর, চমের মোজা, জুতা ও পাগড়ি পরিধান করেন। (১০) তিনি কখনো পাগড়ির একাংশ মুখের তালুর নিচ দিয়ে দিতেন, পাগড়ির কিনারা কখনো পিছনে ঝুলে রাখতেন, আর কখনো ঝুলে রাখতেন না। (১১) তিনি কালো রং -এর কাপড় পরিধান করেন এবং তিনি লাল-ডোরদার 'হুল্লা'-তথা লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেন।"-সহীহ্ বোখারী, (১২) তিনি রূপার আংটি পরেন, আর তার নাগীনা হাতের কজার দিকে রাখতেন। (১৩) তিনি যখন কোন নতুন কাপড় পরতেন, তখন প্রথমে তার নামকরণ করতেন, তারপর এ দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِي (هذا القميص أو الرداء أو العمامة) أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু, আনতা কাসাওতানীহ্, আস্আলুকা খায়রাহু ওয়া-খায়রা মা-সুনিআ লাহু, ওয়া-আউযুবিকা মিন শাররিহী, ওয়া-শাররি মা-সুনিয়া লাহু ;-অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছো, আমি তোমার নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং এটি যে জন্য তৈরী করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করি, আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি তৈরীর অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি।"-সুনানে তিরমিযী, আবূ দাউদ, (১৩) তিনি অযু করা, জুতা পরিধান করা, মাথা আঁচড়ানো এবং আদান-প্রদান ডান দিক থেকে করতে ভালবাসতেন। (১৪) তিনি যখন হাঁচি দিতেন তখন

মুখের উপর নিজের হাত বা কাপড় রাখতেন এবং হাঁচির আওয়াজ নিচু করতেন। (১৫) তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, (১৬) তিনি হাঁসির বিষয় হলে হাঁসতেন এবং কাঁদার বিষয় হলে কাঁদতেন, তবে তাঁর অধিকাংশ হাঁসা ছিল মুচকি হাসি, আর সর্বাধিক হাসির সময় তাঁর দু'পার্শ্বের দাঁত দেখা যেতো, তিনি কখনই মুখগহ্বর বা কণ্ঠতালু পর্যন্ত প্রকাশ করে ক্বাহ্-ক্বাহ্ করে হাসেননি, পক্ষান্তরে তাঁর কান্নাও অনুরূপ ছিল, তিনি কখনই গাধার মতো চিৎকার করে উচ্চঃস্বরে কাঁদেননি, তবে তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হতো এবং তাঁর বক্ষে ফুটন্ত হাঁড়ির ন্যায় আওয়াজ শোনা যেতো।"

(২৪) সালামের আদান-প্রদান ও অনুমতি প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ২/৩৭১}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গোত্রের নিকট গমন করলে তাদের সালাম করতেন এবং তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন কালেও সালাম করতেন এবং সালামের ব্যাপক প্রচলন করার নির্দেশ দেন। (২) তিনি বলেনঃ ছোট সালাম করবে বড়কে, পদচারী সালাম করবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, আরোহী ব্যক্তি সালাম করবে পদচারীকে এবং কম সংখ্যক লোকেরা সালাম করবে বেশী সংখ্যক লোককে।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম (৩) তিনি কারো সাথে সাক্ষাৎ কালে প্রথমেই সালাম করতেন, আর কেউ তাঁকে সালাম করলে, তিনি সাথে সাথে অনুরূপ কিংবা তার চেয়ে উত্তমরূপে উত্তর দিতেন, কিন্তু নামায অথবা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করা ইত্যাদি বিশেষ কারণে সালামের উত্তর বিলম্বিত করতেন। (৪) তিনি প্রথমে السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্,-বলে সালাম করতেন ;-অর্থাৎ, তোমাদের উপর শান্তি

বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমতও। প্রথমে সালাম প্রদানকারীর পক্ষে عَلَيْكَ السَّلَام 'আলাইকাস্ সালাম'-বলা অপছন্দ করতেন (কারণ এটা মৃতদের সালাম) এবং তিনি সালাম প্রদানকারীকে বলতেনঃ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ 'ওয়া আলাইকাস্ সালাম' আরবী শব্দ 'ওয়াও'- এর সাথে। (৫) তাঁর আদর্শ ছিল, যদি জামায়াত-সমাবেশ খুব বড় ও বিরাট হয় যেখানে এক সালাম সবার নিকট পৌছে না তখন তিনি তিন দিকে তিনবার সালাম করতেন। (৬) তাঁর আদর্শ ছিল, মসজিদে প্রবেশকারী প্রথমে দু'রাকাত 'তাহাইয়্যাতুল মসজিদ' আদায় করবে, অতঃপর সমাবেশে এসে তাদের সালাম করবে। (৭) তিনি হাতের ইশারায় অথবা মাথা নাড়িয়ে অথবা আঙ্গুলের ইশারায় সালামের উত্তর দিতেন না, তবে শুধু নামাযরত অবস্থায় তিনি ইশারায় সালামের উত্তর দেন। (৮) তিনি শিশু-কিশোরদের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় তাদের সালাম করেন, অনুরূপ মহিলাদের সমাবেশ দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় তাদের সালাম করেন, আর সাহাবীগণ জুমআর নামায পড়ে ফেরার পথে এক বৃদ্ধা মহিলাকে সালাম করতেন, {যিনি বীটের শিকড় ও যবের দানা পিষে তাদের জন্যে খাবার তৈরী করতেন।"-অনুবাদক} (৯) তিনি অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য সালাম প্রেরণ করতেন এবং তিনি সালাম বহনও করতেন। {উম্মল মু'মিনীন খাদিজা ও আয়েশা (রাযিঃ)-কে জিবরীল আমীন (আঃ)-এর সালাম পৌছান।"-অনুবাদক} আর তাঁকে কেউ অন্যের প্রেরিত সালাম পৌছালে, তিনি সালাম প্রেরণকারী ও বহনকারী উভয়কে সালামের উত্তর দিতেন, {অর্থাৎ, বলতেনঃ ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিস্ সালাম।"-অনুবাদক} (১০) তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ এক ব্যক্তি যখন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে, সে কি তার প্রতি মাথা ঝুকাবে ? তিনি উত্তরে বলেনঃ না, আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ সে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে

এবং চুমা খাবে ? উত্তরে তিনি বলেনঃ না, আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ সে কি তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মুসাফাহা করবে ? উত্তরে তিনি বলেনঃ হাঁ।"-সুনানে তিরমিযী, (১১) তিনি পরিবার-পরিজনের নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে-হঠাৎ এসে উপনীত হতেন না যাতে তারা ভয় পায়, বরং তিনি তাদের সালাম করতেন এবং প্রবেশ করে প্রথমে মিসওয়াক করতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। (১২) তিনি রাত্রিবেলায় পরিবার-পরিজনের নিকট গমন করলে এমনভাবে সালাম করতেন যা নিদ্রিত লোকদের জাগাতো না, তবে জাগ্রত লোকেরা তাঁর সালাম শুনে নিতো।"-সহীহ্ মুসলিম, (১৩) তাঁর আদর্শ ছিল যে, যখন অনুমতিপ্রার্থীকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কে ? তখন সে জবাবে বলবেঃ আমি অমুকের পুত্র অমুক, অথবা সে নিজের উপনাম বা ডাকনাম ইত্যাদি বলবে, আর সে যেন 'আমি' বা এ ধরণের অস্পষ্ট কিছু না বলে। (১৪) তিনি তিনবার করে অনুমতি চাইতেন, অনুমতি দেয়া না হলে তিনি ফিরে যেতেন। (১৫) তিনি সাহাবীদেরকে অনুমতি চাওয়ার পূর্বে সালাম করা শিক্ষা দিতেন। (১৬) তিনি কারো বাড়ীতে গেলে তাদের দরজার সামনে দাঁড়াতেন না, বরং ডান কিংবা বাম দিকে সরে দাঁড়াতেন। (১৭) তিনি বলেনঃ দৃষ্টি পড়ার কারণেই তো অনুমতি নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

(২৫) কথা-বার্তা ও নীরবতা, বক্তব্য-ভাষণ ও সুন্দর নামকরণ প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ১/১৭৫, ২/৩২০}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক শুদ্ধভাষায় বাক্যালাপে পারদর্শী এবং তাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদানকারী ছিলেন। (২) তিনি দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকতেন বিনা

প্রয়োজনে কথা বলতেন না, আর যেই বিষয়টি তাঁর সাথে সম্পৃক্ত নয় সেই ব্যাপারে তিনি কোন কথা বলতেন না, তিনি যে বিষয়ে সাওয়াবের আশা করতেন শুধু সেই বিষয়েই কথা বলতেন। (৩) তিনি 'জাওয়ামেউল কালিম'-তথা ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য' দ্বারা সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন, যা গণনাকারী গণনা করতে সক্ষম হতো, তা অতিদ্রুত ও তাড়াহুড়া করে বলা হতো না যা সংরক্ষণ করা যায় না, আর না তা কর্তিত ও বিচ্ছিন্ন ছিল যার মাঝে নীরবতা হতো। (৪) তিনি স্বীয় ভাষণে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শব্দ চয়ন করতেন এবং স্বীয় উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মনোনীত করতেন, তিনি কখনো গালমন্দকারী ও অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী ছিলেন না। (৫) তিনি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন শব্দ অনোপযুক্ত লোকদের শানে ব্যবহার করা, কিংবা অপছন্দনীয় শব্দ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের শানে ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন, সুতরাং তিনি কোন মুনাফিক ব্যক্তিকে 'সাইয়্যেদ'-বা নেতা বলে সম্বোধন করতে নিষেধ করেন এবং আবূ জাহেলকে আবূল হাকাম বলতে বারণ করেন, অনুরূপ কোন রাজা-বাদশাহকে রাজাধিরাজ অথবা পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা ইত্যাদি বলতে নিষেধ করেন। (৬) তিনি সেই ব্যক্তিকে দিকনির্দেশনা দেন যাকে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, সে যেন আল্লাহর নাম স্বরণ করে 'আউযু বিল্লাহ্'-অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি,-বলে এবং শয়তানের প্রতি লা'নত-অভিশাপ না করে এবং তাকে গালি না দেয়, অনুরূপ 'শয়তান ধ্বংস হোক'-ইত্যাদি না বলে। (৭) তিনি সুন্দর নাম পছন্দ করতেন এবং তিনি নির্দেশ দেন যে, কেউ তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করলে যেন সুন্দর নাম ও সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট লোককে দূত হিসেবে প্রেরণ করে, তিনি নামের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করতেন, তিনি ব্যক্তির সাথে তার নামের সংযুক্তি করতেন।

(৮) তিনি আরো বলেনঃ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম হলো 'আব্দুল্লাহ্'-আল্লাহর বান্দা, ও 'আব্দুর রহমান'-করুণাময় আল্লাহর বান্দা এবং সর্বাধিক সত্য নাম হলো 'হারেস'-যমীন আবাদকারী ও 'হাম্মাম'-অত্যধিক চিন্তা-ভাবনাকারী, আর সর্বাপেক্ষা মন্দ নাম হলো 'হারব'-লড়াই-যুদ্ধ এবং 'মুর্‌রাহ'- তিক্ত স্বাদযুক্ত।"-সহীহ্ মুসলিম, (৯) তিনি 'আস্বিয়াহ'-পাপী মহিলা'- নাম পরিবর্তন করে তাকে বলেনঃ তুমি 'জামীলাহ্'-সুন্দরী ও সচ্চরিত্রবর্তী মহিলা। অনুরূপ তিনি 'আস্‌রম'-অভাবী -নাম পরিবর্তন করে 'যুরাআহ্'-ফসল ও বীয বপণকারী -নামকরণ করেন। তিনি মদীনায় গমন করে তার পুরাতন নাম 'ইয়াস্‌রিব'-পরিবর্তন করে 'তাইয়্যেবাহ্'-পবিত্র, উত্তম ভূমি নামকরণ করেন। (১০) তিনি নিজের সাথীদের ডাকনাম বা উপনাম রাখতেন, অনেক সময় শিশু-কিশোরদেরও ডাকনাম রাখেন এবং স্বীয় স্ত্রীদের কারো কারো ডাকনাম রাখেন। (১১) তাঁর আদর্শ ছিল যার ছেলেসন্তান আছে, আর যার ছেলে-সন্তান নেই উভয়ের ডাকনাম রাখা এবং তিনি বলেনঃ তোমরা আমার নামে নাম রেখো, কিন্তু আমার ডাকনামে ডাকনাম রেখো না।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, {অর্থাৎ, একই ব্যক্তির নাম মুহাম্মাদ এবং ডাকনাম আবুল ক্বাসিম' রাখা যাবে না।"-অনুবাদক} (১২) তিনি রাতের আহারের নাম 'আশা-উন'-পরিত্যাগ করে অধিকহারে 'আতামাহ্'-তথা অন্ধকার বলতে নিষেধ করেন এবং আঙ্গুর ফলকে 'কারম'-বলতে বারণ করে বলেনঃ কারম তো হলো ঈমানদারের ক্বলব।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, (১৩) তিনি নিম্নোক্ত বাক্যাবলী ব্যবহার করতে নিষেধ করেনঃ- অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ্ যা চায় এবং তুমি যা চাও তাই হয়, {বরং বলবেঃ আল্লাহর ইচ্ছা, অতঃপর তোমার ইচ্ছা হলে} আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের

নামে শপথ করা, বেশী বেশী কসম করা, অথবা কসমে এরূপ বলাঃ যদি অমুক কাজ করে, তাহলে সে ইহুদী বা খ্রীষ্টান হয়ে যাবে, মালিক নিজের ক্রিত দাস-দাসীকে আমার বান্দা ও আমার বান্দী বলা, আমার আত্মা 'খবীস'-কলুষিত হয়ে গেছে এরূপ বলা, (বরং যদি একান্তই বলতে হয়, তাহলে বলবেঃ আমার মন খারাপ বা দূর্বল হয়ে পড়েছে।"-সহীহ্ বোখারী, অথবা শয়তান ধ্বংস হোক বলা, আর 'হে আল্লাহ্! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা কর, এরূপ বলতে নিষেধ করেন, বরং দৃঢ়তা সহকারে দু'আ করবে। (১৪) তিনি যুগ বা কালকে গালি দেয়া, বাতাসকে গালি দেয়া, জ্বরকে গালি দেয়া, {জ্বর মানুষের পাপরাশিকে দূর করে যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে।"-সহীহ্ মুসলিম} মোরগকে গালি দেয়া {মোরগ নামাজের জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়।"-সুনানে আবূ দাউদ} এবং ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের ন্যায় বংশের খোঁটা দেয়া বা নির্বিচারে বংশের পক্ষপাতিত্ত করা ইত্যাদি হতে নিষেধ করেন।"

(২৬) উঠা-বসা ও চলা-ফেরা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ

{যাদুল মাআদ, ১/১৬১}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে ভর দিয়ে চলতেন যেন তিনি নিম্নভূমিতে অবতরণ করছেন, তাঁর চলাফেরা ছিল সর্বাপেক্ষা সুন্দর, দ্রুতগতীতে এবং শান্তশিষ্ট ও ধীরস্থিরভাবে। (২) তিনি খালী পায়ে ও জুতা পরে চলাফেরা করতেন। (৩) তিনি উট, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার উপর আরোহন করেন, তিনি ঘোড়ার উপর কখনো লেগাম পরানো অবস্থায়, আবার কখনো লেগাম পরানো ছাড়াই আরোহণ করেন, আবার কখনো কাউকে সাওয়ারীর উপর সামনে ও পিছনে উঠিয়ে নিতেন। (৪) তিনি যমীনের উপর, আবার কখনো

চাটাইয়ের উপর, আবার কখনো বিছানার উপর বসতেন। (৫) তিনি বালিশের উপর টেক লাগাতেন, আবার কখনো নিজের বাম-পার্শ্বের উপর, আবার কখনো নিজের ডান-পার্শ্বের উপর। (৬) তিনি অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় বসতেন, আবার কখনো চিৎ হয়ে শোতেন, আবার কখনো এক পায়ের উপর অপর পা রাখতেন, দূর্বলতার কারণে প্রয়োজন বিশেষ সাহাবীদের কারো উপর টেক লাগাতেন। (৭) তিনি কোন ব্যক্তি সূর্য ও ছায়ার মাঝখানে বসতে নিষেধ করেন। (৮) তিনি কোন বৈঠক আল্লাহর যিকর হতে খালী হওয়াকে অপছন্দ করে বলেনঃ যে কেউ কোন বৈঠকে বসে আল্লাহর যিকর না করে, তাহলে সেই বৈঠক আল্লাহর নিকট তার জন্য হতাশা ও আক্ষেপের কারণ হবে।"-সুনানে আবূ দাউদ, (৯) তিনি আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসলো যেখানে অত্যধিক আলাপ-আলোচনা হয়, আর সে ঐ মজলিস হতে উঠার পূর্বে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলো, তাহলে তার জন্য তা কাফ্ফারা স্বরূপ হবে।"-সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া-বিহাম্‌দিকা, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা, আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া-আতূবু ইলাইকা ;- অর্থাৎ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ্! তোমারই প্রশংসার সাথে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।"

(২৭) সিজদায়ে শুক্‌র প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ}

আল্লাহর কোন সুস্পষ্ট নেআমত লাভের পর, অনুরূপ কোন সুস্পষ্ট বিপদ কেটে যাবার পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সিজদা করা তাঁর এবং সাহাবীদের আদর্শ ছিল।"

(২৮) আশংকা, বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তার চিকিৎসা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ১/১৮০}

(১) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদাপদের সময় বলতেনঃ

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السبع وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি মহান সহনশীল, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি মহান আরশের প্রভূ, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি সপ্ত-আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং সম্মানিত আরশের মালিক।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, (২) তাঁর নিকট কোন কঠিন কাজ আপতিত হলে বলতেনঃ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ -ইয়া-হাইয়্যু ইয়া-ক্বাইয়্যুমু, বিরাহ্মাতিকা আস্তাগীস ;- অর্থাৎ, হে চিরঞ্জিব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ - কারী! তোমারই অনুগ্রহে সাহায্য প্রার্থনা করছি।"-সুনানে তিরমিযী, তিনি বলেনঃ দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্টে পতিত ব্যক্তির দু'আ হলোঃ

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রাহমাতাকা আরজূ, ফালা-তাকিল্‌নী ইলা-নাফ্‌সী ত্বারফাতা-আইনিন, ওয়া-আস্‌লিহ্‌লী শানী-কুল্লাহু, লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা ;-অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তোমারই রহমতের আকাঙ্খী আমি, সুতরাং তুমি চোখের পলক পরিমাণ এক মুহর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না, তুমি আমার সমস্ত কাজ সুন্দর করে দাও, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই।"-সুনানে আবূ দাউদ, আর কোন কঠিন কাজ উপনীত হলে তিনি নামায পড়তেন।"-সুনানে আবূ দাউদ, (৩) তিনি আরো বলেনঃ যদি কোন চিন্তা-ভাবনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ্ তার দুশ্চিন্তা দূরীভুত

করবেন এবং চিন্তা-ভাবনার স্থলে শান্তি-খুশী সঞ্চারিত করবেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আব্দুকা ওয়া-ইবনু আব্দিকা, ওয়া-ইবনু আমতিকা, না-সিয়াতী বিয়াদিকা, মাযিন-ফীয়্যা হুকমুকা, আদ্‌লুন ফীয়্যা-ক্বাযা-উকা, আস্‌আলুকা বিকুল্লি-ইস্‌মিন হুয়া-লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফ্‌সাকা, আউ আল্লাম্‌তাহু আহাদান্ মিন খালক্বিকা, আউ আন্‌যালতাহু ফী কিতাবিকা, আউ ইস্‌তা'সারতা বিহী ফী ইলমিল গাইবে এন্‌দাকা, আন্-তাজ্‌আলাল্ কোরআন রাবীয়া'-ক্বাল্‌বী, ওয়া-নূরা সাদ্‌রী, ওয়া-জিলায়া-হুয্‌নী, ওয়া-যেহাবা হাম্মী ;- অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি তোমার বান্দা এবং তোমার এক বান্দার পুত্র, আর তোমার এক বান্দীর পুত্র, আমার কপালের লিখা বা ভাগ্য তোমারই হাতে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফায়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যেসব দিয়ে তুমি নিজের নামকরণ করেছো, অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে শিখিয়ে দিয়েছো, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো,- তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কোরআনুল কারীমকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠের বিদূরণকারী।"-মুসনদে আহমদ, (৪) তিনি আশংকার সময় সাহাবীদের এ দু'আটি শিক্ষা দিতেনঃ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ و

أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

উচ্চারণঃ আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মা-তি, মিন গযবিহী ওয়া এক্বাবিহী, ওয়া শাররি-এবাদিহী, ওয়া মিন হামাযা-তিশ শায়াত্বীনি, ওয়া আউযু বিকা-রাব্বি আইয়াহয়ুরূন।"-সুনানে তিরমিযী, আবূ দাউদ, অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর গযব ও আযাব হতে এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, আর শয়তানদের কুমন্ত্রণা হতে, হে প্রভু! আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি তাদের উপস্থিতি থেকে। (৫) তিনি আরো বলেনঃ যে কেউ বিপদে পতিত হয়ে এ দু'আটি পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ্ সেই বিপদের বিনিময়ে তাকে সাওয়াব প্রদান করবেন এবং উহা অপেক্ষা উত্তম কিছু তাকে দান করবেন ঃ- إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ اجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ঃ- উচ্চারণঃ ইন্না-লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুসিবাতী ওয়া আখলিফ্লী খাইরাম্-মিনহা।"-সহীহ্ মুসলিম, -অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে ;- হে আল্লাহ্! আমাকে আমার বিপদের প্রতিদান দান করো এবং উহা অপেক্ষা উত্তম স্থলাভিষিক্ত কিছু প্রদান করো।"-সহীহ্ মুসলিম,

(২৯) সফর-ভ্রমন প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালাঃ {যাদুল মাআদ, ১/৪৪৪}
(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার ও দিনের প্রথম দিকে সফরে রওয়ানা হওয়া পছন্দ করতেন।"-সহীহ্ বোখারী ও সহীহ্ মুসলিম, (২) সফরসংগী ছাড়া মুসাফিরের পক্ষে রাতে একাকী সফর করা তিনি অপছন্দ করতেন, অনুরূপ কোন ব্যক্তি একাকী সফর করা তিনি অপছন্দ করতেন।"-সহীহ্ বোখারী, (৩) তিনি মুসাফিরদের প্রতি নির্দেশ জারী করেন যে, তারা তিনজন হলে যেন নিজেদের মধ্য

হতে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে।”-সুনানে আবূ দাউদ, (৪) তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করে তিনবার 'আল্লাহু আকবর'-বলতেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ সমূহ পাঠ করতেন ঃ-

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা, ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন, ওয়া-ইন্না ইলা-রব্বিনা লামুনক্বালিবূন, আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা-হাযাল বির্রা ওয়াত তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল আমালে মা-তারযা, আল্লা-হুম্মা হাওয়েন আলাইনা সাফারানা-হাযা, ওয়াত্বি আন্না বুঅদাহু, আল্লা-হুম্মা আন্তাস-সাহিবু ফিস্-সাফার, ওয়াল-খালীফাতা ফিল-আহাল, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ওয়া'সাইস সাফার, ওয়া কা'বাতিল মানযার, ওয়া সূইল মুনক্বালাবি ফিল-মালি, ওয়াল-আহলি ;- অর্থাৎ, পাক-পবিত্র সেই মহান সত্বা, যিনি এটিকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় একে বশীভূত করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী, হে আল্লাহ্! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করছি নেকী ও তাক্বওয়ার এবং এমন আমলের সামর্থ যাতে তুমি রাযী-খুশী হও, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ-সাধ্য করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য গুটিয়ে দাও, হে আল্লাহ্! তুমি সফরে আমাদের সাথী এবং পরিবারে আমাদের প্রতিনিধি-রক্ষণাবেক্ষণকারী, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত কষ্টদায়ক-মর্মান্তিক দৃশ্যের দর্শন

হতে, আর নিজেদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের ক্ষয়ক্ষতিকর অনিষ্টকর দৃশ্যের দর্শন হতে ; আর তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এ দু'আটি অতিরিক্ত পড়তেনঃ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ - আইবূনা তাইবূনা আবিদূনা লি-রব্বিনা হামিদূন ;- অর্থাৎ, আমরা প্রত্যাবর্তনকারী নিরাপত্তার সাথে, আমরা তাওবাকারী, আমরা নিজেদের প্রভুর ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী।"-সহীহ্ মুসলিম, (৫) যখন তিনি উঁচু ভূমিতে উঠতেন 'আল্লাহু আকবর'-তাকবীর বলতেন এবং যখন সমভূমি-উপত্যকার দিকে নামতেন 'সুবহানাল্লাহ্'-বলতেন।"-সুনানে আবূ দাউদ, এক ব্যক্তি বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সফরে যেতে মনস্থ করেছি, তখন তিনি বলেনঃ তুমি অবশ্যই 'তাক্বওয়া'-আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন করবে, আর প্রত্যেক উঁচু জায়গায় উঠার সময় তাকবীর বলবে।"-সুনানে তিরমিযী, (৬) সফরকালে ভোরের আলো উদ্ভাসিত হলে তিনি বলতেনঃ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ النَّار অর্থাৎ, এক সাক্ষ্যদানকারী সাক্ষ্য দিল আল্লাহর প্রশংসার, আর অগণিত নিয়ামত আমাদের উপর উত্তমরূপে বর্ষিত হলো, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের সঙ্গে থাকুন, প্রদান করুন আমাদের উপর অফুরন্ত নিয়ামত, আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নামের আগুন হতে আশ্রয় প্রার্থনাকারী।"-সহীহ্ মুসলিম, (৭) তিনি সফরকালে পরিবার-পরিজনকে বিদায় দানের সময় বলতেনঃ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ أَعمالِكَ উচ্চারণঃ আস্‌তাওদিউল্লাহা দ্বীনাকা, ওয়া-আমানাতাকা, ওয়া-খাওয়াতীমা আ'মা-লিক;- অর্থাৎ, আমি তোমার দ্বীন-ধর্ম, তোমার আমানত এবং তোমার আমল সমূহের সমাপ্তি আল্লাহর হেফাযতে রেখে যাচ্ছি।"-সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, (৮) তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ সফরে কোন স্থানে অবতরণ করলে তখন বলবে ঃ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ উচ্চারণঃ আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা-খালাক ;-অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমা সমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে ;- তাহলে সেই স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন বস্তু তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।"-সহীহ্ মুসলিম, (৯) তিনি মুসাফিরের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর অবিলম্বে নিজের পরিবার -পরিজনের নিকট ফিরে আসার নির্দেশ দিতেন। (১০) তিনি মহিলাকে মাহরাম পুরুষ সাথী ছাড়া সফর করতে নিষেধ করতেন, যদিও ডাকযোগা-যোগের দূরত্ব, তথা প্রায় ১২ মাইল হয়, এবং তিনি কাফের শত্রুদের দেশে কোরআন মজীদ নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেন শত্রুদের হস্তগত হওয়ার আশংকায়। (১১) তিনি মুসলিমকে কাফের-মুশরিকদের মাঝে বসবাস করতে নিষেধ করেন, যদি সে হিজরত করার শক্তি-সামর্থ্য রাখে এবং বলেনঃ যে সকল মুসলমান কাফের-মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে, তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন।"-সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, তিনি আরো কলেনঃ যে কেউ কাফের-মুশরিকের সঙ্গী হয় এবং তার সাথে বসবাস করে সেও তার মতো।"-সুনানে আবূ দাউদ, (১২) তাঁর সফর চার প্রকার ছিল (১) হিজরতের সফর, (২) জিহাদের সফর, আর এটাই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক (৩) ওমরার সফর, (৪) হজ্জের সফর। (১৩) তিনি সফরে চার রাকাতের ফরয নামাযকে কসর করে দু'রাকাত পড়তেন সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় হতে ফিরে আসা পর্যন্ত, আর তিনি সফরে শুধুমাত্র ফরয নামায আদায় করতেন, তবে তিনি ফজরের সুন্নাত ও বিতর নিয়মিত পড়তেন। (১৪) তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ বা দূরত্ব নির্ধারণ করেননি যা অতিক্রম করার পর নামায কসর করা কিংবা রোযা ছেড়ে দেয়া বিধেয় হবে। {বরং প্রচলিত অর্থে যাকে সফর

বলা হয়, সেই সফরে নামায কসর করা চলবে।"-অনুবাদক} (১৫) তাঁর আদর্শ ছিল না সফরে সাওয়ারীতে আরোহণ কালে 'জম্‌অ' করা -তথা দুই ওয়াক্তের নামায একত্রিত করে আদায় করা, আর না অবতরণের কালে, বরং তিনি শুধু সফর দ্রুতগতীতে হলেই 'জমঅ' করতেন, সুতরাং সূর্য ঢলার আগে তিনি সফর শুরু করলে, তখন যোহরকে আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন, অতঃপর সাওয়ারী হতে অবতরণ করে যোহর ও আসর একত্রিত করে আদায় করতেন, আর সফর শুরু করার আগেই সূর্য ঢলে গেলে, তখন তিনি যোহরের নামায পড়ে সাওয়ারীতে আরোহণ করতেন, অনুরূপ সফর দ্রুতগতীতে হলে তিনি মাগরিবের নামায বিলম্বিত করে এশার নামাযের সাথে একত্রিত করে এশার ওয়াক্তে আদায় করতেন। (১৬) তিনি সফরে দিবারাত্রে নফল নামায সাওয়ারীর উপরই পড়তেন, সাওয়ারী যে দিকেই ফিরে আছে সেই দিকেই নামায আদায় করতেন এবং রুকু-সিজদা ইশারার মাধ্যমে আদায় করতেন এবং সিজদার সময় মাথা রুকু হতে অধিক নত করতেন, (কিন্তু ফরয নামায আদায়ের ইচ্ছা করলে সাওয়ারী হতে অবতরণ করে ক্বিবলার দিকে মূখ করে আদায় করতেন, (১৭) তিনি মাহে রামযানে সফর করেন এবং রোযা না রেখে ইফতার করেন, সাহাবীদের রোযা রাখা ও না রাখা উভয়ের অনুমতি দেন। (১৮) তিনি সফরে সর্বদা কিংবা অধিকাংশ সময়ে চর্মের মোজা পরিধান করতেন। (১৯) তিনি কোন ব্যক্তিকে সফরে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার পর হঠাৎ রাত্রিবেলায় পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসতে নিষেধ করেন।"-সহীহ্ বোখারী, (২০) তিনি বলেনঃ ফেরেশ্‌তাগণ সেসব কাফেলার সফরসঙ্গী হয় না, যাদের সাথে কুকুর অথবা ঘন্টা থাকে।"-সহীহ্ মুসলিম, (২১) তিনি সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায়

করতেন, অতঃপর পরিবারের শিশু-কিশোরদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। (২২) তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর সাথে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করতেন এবং নিজ পরিবারের লোক হলে তাকে চুমা দিতেন।"

(৩০) ডাক্তারী-চিকিৎসা ও রোগীর দেখা-শোনা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ৪/৯}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ ছিল নিজের চিকিৎসা করা এবং নিজ পরিবার ও সাহাবীদের কেউ অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা করার আদেশ করা। (২) তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার কোন চিকিৎসা নেই।"-সহীহ্ বোখারী, তিনি আরো বলেনঃ হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা করো।"-সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী, (৩) তিনি তিন প্রকারে রোগীর চিকিৎসা করতেন (১) প্রাকৃতিক ঔষধসমূহ দ্বারা, (২) 'ইলাহী দাওয়া'-তথা শিরকমুক্ত ঝাড়-ফুঁক দ্বারা, (৩) উভয়ের সমুষ্টির দ্বারা। (৪) তিনি মদকদ্রব্য ও অপবিত্র বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেন। (৫) তাঁর সাহাবীদের কেউ অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তিনি তাকে দেখতে যেতেন, তিনি মরণমুখী ইহুদী ছেলেটিকে দেখতে যান যে তাঁর খেদমত করতো এবং তাঁর মরণমুখী চাচা (আবূ তালিব)-কে দেখতে যান অথচ সে মুশরিক ছিল এবং উভয়ের উপর ইসলাম পেশ করেন, তখন ইহুদী ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো, কিন্তু তাঁর চাচা (আবূ তালিব) ইসলাম গ্রহণ করেনি। (৬) তিনি রোগীর নিকটবর্তী হতেন এবং তার মাথার নিকট বসতেন এবং তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। (৭) তাঁর আদর্শ ছিল না যে, রোগীকে দেখতে যাওয়ার জন্য কোন দিন বা কোন সময় নির্দিষ্ট করা, বরং তিনি স্বীয় উম্মতের জন্য দিবারাত্র ও সর্বক্ষণ রোগী

দেখতে যাওয়ার বিধান করেন।”

(ক) প্রাকৃতিক ঔষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ৪/২৩}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জ্বরের উৎপত্তি, অথবা বলেছেনঃ কঠিন জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ হতে, সুতরাং তোমরা পানির দ্বারা তা ঠান্ডা করো।”-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, (২) তিনি আরো বলেনঃ তোমাদের কেউ জ্বরে আক্রান্ত হলে তার উপর তিন রাত যাবৎ ভোরে ঠান্ডা পানি ঢেলে দেয়া উচিত। (৩) তিনি জ্বরে আক্রান্ত হলে এক বালতি পানি আনতে বলতেন এবং তা নিজের মাথার উপর ঢেলে দিতেন এবং গোসল করতেন, একদা জ্বর সম্পর্কে তাঁর নিকট আলোচনা করা হয়, তখন এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দিলে তিনি বলেনঃ তোমরা জ্বরকে গালি দিও না, কেননা জ্বর মানুষের পাপরাশিকে দূর করে যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে থাকে।”-সুনানে ইবনে মাজাহ্, (৪) জনৈক ব্যক্তি এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ভাই পেটের অভিযোগ করছে, অন্য বর্ণনায় রয়েছে,- তার পেট ছুটেছে - অর্থাৎ, দস্ত শুরু হয়েছে, তখন তিনি বললেনঃ তাকে মধু পান করাও।”-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, তিনি ঝাড়-ফুঁকের সময় পানির সাথে থুথু মিলাতেন। (৫) এক দল লোক মদীনায় এসে ‘ইস্তিস্ক্বা’- রোগের অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে বলেনঃ যদি তোমরা যাকাতের উট চারণক্ষেত্রে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুধ পান করতে, অতঃপর তারা অনুরূপ করলে সুস্থ্য হয়ে যায়।”-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, আর ‘ইস্তিস্ক্বা’- এক প্রকার রোগবিশেষ যাতে পেট ফুলে যায় এবং পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। (৬) তিনি ওহুদ যুদ্ধে আহত হলে তাঁর কন্যা

ফাতিমা (রাযিঃ) চাটাই-এর একটি টুকরো নিয়ে আগুনে পুড়ে সে ছাই তাঁর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে সাথে সাথে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। তিনি উবাই ইবনে কাআব (রাযিঃ) -এর নিকট একজন ডাক্তার প্রেরণ করেন, সে তার একটি রগ-ধমনী কেটে গরম লোহা দিয়ে দাগ লাগায়, তিনি বলেনঃ (অনেক) রোগের নিরাময় তিনটি জিনিসে, মধু পান করা, সিংগা লাগানো এবং গরম লোহা দিয়ে দাগানো, তবে আমি আমার উম্মতকে গরম লোহা দ্বারা দাগাতে নিষেধ করছি।"-সহীহ্ বোখারী, তিনি আরো বলেনঃ লোহা গরম করে দাগ লাগানো আমি পছন্দ করি না।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, অর্থাৎ, একান্ত বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া লোহা গরম করে দাগ লাগাবে না, যেহেতু তাতে অত্যধিক কষ্ট রয়েছে। (৭) তিনি অসুখের সময় শিঙ্গা লাগান এবং শিঙ্গাদানকারীকে তার মজুরী প্রদান করেন, আর বলেনঃ তোমরা যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও, শিঙ্গা লাগানো তার মধ্যে অন্যতম।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, তিনি এহ্রাম অবস্থায় ব্যথার কারণে মাথায় শিঙ্গা লাগান।"-সহীহ্ বোখারী, তিনি স্বীয় উরুর উপরিভাগে 'ওসা'- তথা হাড় ভাঙ্গা ছাড়া ব্যথা'-এর কারণে শিঙ্গা লাগান, তিনি তিনটি শিঙ্গা লাগতেন, একটি স্কন্ধের মধ্যবর্তী পিছনের অংশে এবং অপর দু'টি দু'কাঁধের পার্শ্বের রগের উপর, তিনি (খাইবর হতে ফেরার পথে ইহুদী মহিলা কর্তৃক) বিষ মিশ্রিত বকরী হতে আহার করার পর স্কন্ধের মধ্যবর্তী পিছনের অংশে তিন বার শিঙ্গা লাগান এবং তিনি সাহাবীদের শিঙ্গা লাগনোর নির্দেশ দেন। (৮) কেউ মাথা ব্যথার অভিযোগ করলে তিনি তাকে বলতেনঃ তুমি শিঙ্গা লাগাও, আর কেউ পাঁয়ে ব্যথার অভিযোগ করলে তিনি তাকে বলতেনঃ তুমি মেহেদী দ্বারা পাঁদ্বয় খেজাব-রং কর।"-সুনানে আবূ দাউদ, (৯) সুনানে তিরমিযীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালল্লামের খাদেমা উম্মু রাফেঅ'

-সালমা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, কোন সময় তাঁর শরীরে আঘাত লাগলে, অথবা কাটা ভিদ্ধ হলে, তিনি তার উপর মেহেদী লাগাতেন। (১০) তিনি আরো বলেনঃ 'এরকুন নাসা' রোগের নিরাময় হলো দুম্বার পাছার নির্জাস, যা প্রতি দিন প্রত্যুষে থুথুর উপর তথা মুখ দৌত করার পূর্বে পান করবে।"-সুনানে ইবনে মাজাহ্, আর 'এরকুন নাসা'- সেই ব্যথাকে বলা হয় যা উরুর উপরিভাগের জোড় থেকে শুরু হয়ে পিছন দিয়ে নিচের দিকে নেমে আসে। (১১) তিনি শরীর কশা এবং পেট মলীন ও নরম করার দাওয়া প্রসঙ্গে বলেনঃ তোমরা নীম-পাতা ও জিরা ব্যবহার করো, কেননা উহাতে প্রত্যেক রোগের নিরাময় রয়েছে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া।"-সুনানে ইবনে মাজাহ্, (১২) তিনি আরো বলেনঃ তোমাদের সর্বোত্তম সুরমা হলো 'ইস্‌মদ'-তথা কালো সুরমা, যা চক্ষু পরিস্কার করে এবং চুল উৎপন্ন করে।"-সুনানে আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, (১৩) তিনি আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যুষে সাতটি আজওয়া খেজুর খেয়ে নেবে, সে দিন কোন বিষ বা জাদুটোনা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, (১৪) তিনি আরো বলেনঃ তোমরা রোগীদেরকে পানাহারের উপর জবরদস্তি করো না, কেননা আল্লাহ্ই তাদেরকে পানাহার করান।"-সুনানে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, (১৫) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইব (রাযিঃ)-কে খেজুর হতে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেন, সে চক্ষুপীড়া অবস্থায় খেজুর খাওয়ায় অসম্মতি প্রকাশ করেন, তবে কয়েকটি খেজুর খাওয়ায় সম্মতি প্রকাশ করেন, আর তিনি আলী (রাযিঃ)-কে 'রুতাব'-তথা তাজা খেজুর হতে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেন যখন সে চক্ষুপীড়ায় ভুগছিল। (১৬) তিনি বলেনঃ যখন তোমাদের কারো খাবারের পাত্রে মাছি পড়ে, তাহলে অবশ্যই গোটা মাছিটা তাতে ডুবিয়ে দেবে, অতঃপর সেটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কারণ

তার এক ডানাতে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা, আর অপর ডানাতে রোগজীবাণু রয়েছে, আর মাছি প্রথমে রোগজীবানুযুক্ত পাখাটি খাবারের মধ্যে ঢুকিয়ে থাকে, তাই দ্বিতীয় ডানাটা পাত্রে ঢুকিয়ে দিতে হবে।"-সহীহ্ বোখারী, (১৭) তিনি আরো বলেনঃ 'তালবীনা' রোগীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে এবং দুশ্চিন্তা দূরীভূত করে।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, আর 'তালবীনা' হলো এক প্রকার লঘু পাক খাদ্য, যা গম-যবের আটা ভূষি সহ পানিযোগে তৈরী করা হয়। (১৮) তিনি বলেনঃ তোমরা কালাজিরা ব্যবহার করো, কেননা তাতে মৃত্যু ব্যতীত আর সকল রোগের চিকিৎসা রয়েছে।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, (১৯) তিনি বলেনঃ তোমরা কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে পলায়ন করো, যেভাবে পলায়ন করে থাকো ব্যাঘ্র থেকে।"-সহীহ্ বোখারী, তিনি আরো বলেনঃ অসুস্থ্য ব্যক্তি সুস্থ্য ব্যক্তির নিকট গমন করবে না।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, (২০) সাক্বীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের মধ্যে এক লোক কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত রোগী ছিল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি দূত প্রেরণ করে বলেনঃ তুমি ফিরে যাও, আমরা তোমার বাইয়াত গ্রহণ করে নিয়েছি।"-সহীহ্ মুসলিম,

(খ) 'ইলাহী দাওয়া'-তথা ঝাড়ফুঁক দ্বারা চিকিৎসা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ৪/১৪৯}

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিন-শয়তান ও বদ-নযর হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং বদ-নযর দূরীকরণার্থে ঝাড়ফুঁক করার নির্দেশ দেন, আর বলেনঃ বদ-নযর লাগা এক বাস্তব সত্য, যদি কোন বস্তু ভাগ্য অতিক্রম করে থাকতো, তাহলে বদ-নযরই ভাগ্য অতিক্রম করতো, আর যদি তোমাদের কারো নিকট গোসল করে পানি দানের জন্য অনুরোধ করা হয়, তখন সে যেন গোসল করে পানি

দেয়।"-সহীহ্ মুসলিম, (অতঃপর গোসলে ব্যবহৃত সেই পানি দ্বারা বদ-নযরগ্রস্ত রোগী গোসল করবে। (২) তিনি একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন যে, তার চেহারায় বদ-নযর লাগার আলামত রয়েছে, তখন তিনি বললেনঃ একে ঝাড়ফুঁক কর, কেননা তার উপর বদ-নযর লেগেছে।"-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত 'সাঅফাহ্'-শব্দের মর্মার্থঃ জ্বিন-শয়তানের বদ-নযর। (৩) তিনি সেই সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেন যিনি বিচ্ছুতে দংশিত ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করার ফলে সে সুস্থ্য হয়ে ছিল, কে তোমাকে জানালো যে, সূরা ফাতিহা ঝাড়ফুঁকের কাজ করে ? -সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, (৪) এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললোঃ গতরাত আমাকে বিচ্ছু দংশন করেছে, তখন তিনি বলেনঃ যদি তুমি সন্ধাবেলায় বলতে ঃ-
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ উচ্চারণঃ আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তা-ম্মাতি মিন শার্‌রি মা-খালাক ;- অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমা সমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে, - তাহলে কোন বস্তু তোমরা ক্ষতি করতে পারতো না।"-সহীহ্ মুসলিম,

(গ) উভয়ের সমষ্টি সহজ ও উপকারী চিকিৎসা প্রসঙ্গে তাঁর আদর্শমালা ঃ {যাদুল মাআদ, ৪/১৭১}

(১) যখন কোন লোক অসুস্থ্য হয়ে পড়তো, অথবা আহত কিংবা জখমী হতো, তখন তিনি তর্জনী আঙ্গুলটি যমীনে রাখতেন, অতঃপর উহা উঠিয়ে বলতেনঃ بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি তুর্‌বাতু আর্‌দিনা, বিরিক্বাতি বা'যিনা, ইউশ্‌ফা সাক্বীমুনা, বিইয্‌নি রাব্বিনা ;- অর্থাৎ, আল্লাহর নামে, আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের একজনের থুথু, আমাদের প্রতিপালকের হুকুমে যেন

আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে।”-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম, (২) কোন সাহাবী তাঁর নিকট ব্যথার অভিযোগ করলে তিনি বলেনঃ তুমি শরীরে ব্যথার স্থানে নিজের হাত রেখে এ দু'আটি সাতবার বলো ঃ

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ -উচ্চারণঃ আউযু বিইয্‌যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শার্‌রি মা-আজিদু ওয়া উহাযির ;- যে অনিষ্ট আমি অনুভব করছি, আর যার আমি আশংকা করছি তা হতে আমি আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদা ও কুদরতের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”-সহীহ্ মুসলিম, আর তিনি (সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে) নিজের কোন বিবির ব্যথার স্থানে ডান-হাত বুলাতেন এবং এ দু'আটি পাঠ করতেনঃ

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বান নাস! ইয্‌হাবিল্ বা'ছা, ওয়া-শ্‌ফিহী আন্তাশ-শাফী, লা-শিফাআন্ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আন্ লা-ইউগাদিরু সুকুমান ;- অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ মানুষের প্রভু ! এ ব্যথা দূর করে দাও এবং আরোগ্য করে দাও, তুমিই তো একমাত্র শেফাদানকারী, তোমার শেফা ছাড়া আর কোন শেফা নেই, সুতরাং এমন শেফা দান কর যা কোন রোগকে না ছাড়ে।”-সহীহ্ বোখারী, মুসলিম , তিনি রোগী দেখতে গেলে বলতেন ঃ

لا بَاسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ উচ্চারণঃ লা-বা'ছা, ত্বাহুরুন ইন্‌শা-আল্লাহ্, ;- অর্থাৎ, ভয়ের কিছুই নেই, ইন্‌আশা-আল্লাহ্ পাপরাশী হতে পবিত্রতা।”-সহীহ্ বোখারী, -আল-হামদুলিল্লাহ্ সমাপ্ত।”

في عباداته ومعاملاته وأخلاقه

منتقى من زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله
باللغة البنغالية
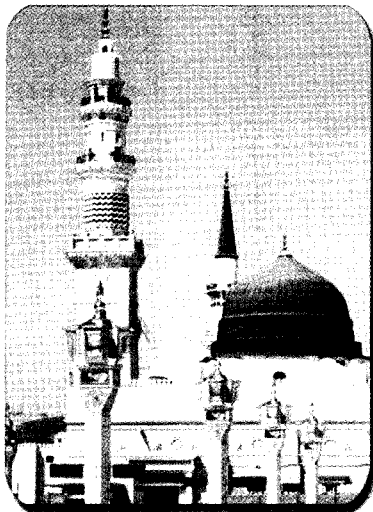
المؤلف الدكتور

أحمد بن عثمان المزيد

ترجمة : محمد عليم الله احسان الله

إصــدار

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام

تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد